মুজাহিদের আযান

জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

মুজাহিদের আযান
জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ

মুজাহিদের আযান
জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মনযূর আহমাদ
নির্বাহী সম্পাদক
মাসিক জাগো মুজাহিদ

জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

মুজাহিদের আযান
মাওলানা মাসউদ আযহার

প্রকাশক
মুফতী আবদুল হাই
চেয়ারম্যান, জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স
তালতলা, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

রচনা
মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ
মনযূর আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৮
ষষ্ঠ প্রকাশ
নভেম্বর-২০০২

কম্পিউটার মেকআপ
এ,জেড, কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার গ্রাফিক

মূল্য ঃ পঁচাত্তর টাকা মাত্র

MUZAHIDER AZAN BY MAOLANA MASUD AZHAR. PUBLISHED BY MUFTI ABDUL HAI, CHAIRMAN JAGO MUZAHID PUBLICATION, KHILGAON, DHAKA. 1ST EDITION AUGUST 1998, SIXTH EDITION NOVEMBER 2002

PRICE : TAKA 75.00 ONLY

উৎসর্গ

আমাদের পূর্ব সীমান্তের ওপারে
স্বাধীনতাহারা, অধিকারবঞ্চিত, নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট,
সম্ভ্রমলুণ্ঠিত লাখো মুসলিম নারী-পুরুষ
যাদের করুণ আহাজারিতে আজও বাতাস ভারাক্রান্ত
তাদের অধিকার আদায় ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়
জালিম জান্তার মোকাবেলায়
শাহাদাতবরণকারী সকল মুজাহিদ
যারা অমর
আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য
আমাদের আত্মার আত্মীয়
তাদের পুণ্যস্মৃতির স্মরণে

- অভিন্ন প্রেরণায় উজ্জীবিত সহযাত্রী

প্রকাশকের কথা

পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর। হৃদয় নিংড়ান দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয়বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

মনের একটি আকাংখা আজ পূর্ণ হল। জিহাদের উপর লেখা একটি বই প্রকাশ করতে পারায় আমি আনন্দিত। যদিও আরও বহু আগে এ ধরনের বই প্রকাশ করা দরকার ছিল, তা পারিনি বলে দুঃখিত। আমি আশা করব, আমার সাথীদেরকে বলব, তাঁরা প্রত্যেকে অবশ্যই এর একটি কপি সংগ্রহ করবেন, বন্ধুদেরকে উপহার দিবেন, পাঠকের হাতে তুলে দিবেন; নিজে গভীর মনোযোগের সাথে পড়বেন, আপন পরিবার ও পরিচিতজনকে পড়ে শুনাবেন। বইটি আমার কাছে ভাল লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভাল লাগবে। যদি একটি মুমিনও এ বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শাহাদাত লাভে ধন্য হয়, তবে আমাদের এ প্রয়াস সফল বলে মনে করব। সকল সাথী ও পাঠকের আন্তরিক সহযোগিতা, সৎপরামর্শ ও ইহ-পরকালের সাফল্য কামনায় –

আব্‌দুল হাই
চেয়ারম্যান
জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

গ্রন্থকার পরিচিতি

মাওলানা মাসউদ আযহার। পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুরে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বংশগতভাবে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। ভাওয়ালপুরের প্রখ্যাত পীর জনাব আল্লাহ দাতা আতা এর পুত্র মাস্টার আল্লাহ বখ্স সাবের এর সন্তান। তিনি আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পাকিস্তানের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মদ হাসান চাগতাই-এর মেয়ের ঘরের দৌহিত্র।

ঈর্ষনীয় মেধার অধিকারী মাওলানা মাসউদ আযহার পড়াশুনা করেন করাচীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপিঠ বিন্নুরী টাউন মাদ্রাসায়। সকল ওস্তাদের প্রিয়পাত্র মাসউদ আযহার অধ্যায়ন শেষে ঐ মাদ্রাসার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তাঁর আধ্যাত্মিক পীর হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুফতী ওলী হাসান।

মাদ্রাসায় পড়া শেষে ১৯৮৯ সনে তিনি আফগান জিহাদে যোগদান করেন। ১৯৯০ সনে 'সদায়ে মুজাহিদ' নামক একটি পাঠকপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নেন। পত্রিকাটি এখনও বেঁচে আছে এবং চলছে।

তিনি সক্রিয়ভাবে জিহাদে যোগদান করেন ১৯৯০ সালের পর থেকে। এ সময় তিনি খোস্ত এলাকার শালকা পোস্টের নিকটে এক ভয়াবহ লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের নিক্ষেপিত রকেট বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। সে আঘাত ভাল হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বারুদের বিষক্রিয়া তাঁর শরীরে রয়ে গেছে।

তাঁর লেখা ও রচনা দারুণ চমৎকার ও সাবলিল। শুধু তা-ই নয় তার লেখাগুলোকে তুলনাহীন বলা যায়।

আলাদা স্বাদ ও আঙ্গিকে লেখা তাঁর পাঠকপ্রিয় বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১। ফাযায়িলে জিহাদ ২। মুজাহিদ কি আযান (দু'খন্ডন) ৩। জিহাদ রহমাত ইয়া ফাসাদ ৪। মেরাভি এক সাওয়াল হ্যায় ৫। ইসলাম মে জিহাদ কি তৈয়্যারী, ৬। আল্লাহ ওয়ালে, ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমের নিকট জিহাদের দাওয়াত পৌছিয়ে বাস্তব কর্মতৎপরতায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে হারান খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে তিনি অতি অল্প সময়ে শত-সহস্র সভা-মহাসমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন,ঘুরে ফিরেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৯, ১৯৯০ ও ১৯৯১-এ বাংলাদেশ সফরে আসেন। পবিত্র হজ্জ্ব সম্পাদন করেন ১৯৮৭ সালে। সে থেকে প্রতি বছর তিনি জিহাদী দাওয়াত নিয়ে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে সফর করেছেন। সে দেশে তিনি মতবিনিময় করেছেন বিখ্যাত ও বিশ্বখ্যাত সব আলিমের সাথে। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে তিনি আরব আমিরাত সফর করেন। সেসব দেশের সভাগুলোয় আরবীতেই তিনি বক্তৃতা করেছেন। আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও দখল রয়েছে আরবী ভাষাবিদের মত। আরবীগণ চমৎকৃত হয়েছিলেন তার সাবলিল আরবী বক্তৃতা ও ভাষণ শুনে।

১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে যথাক্রমে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সফর করেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বিয়া শহরে।

১৯৯৩-এর আগস্টে দীর্ঘ সফর করেন বৃটেনে। তাঁর দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটেনের বহু যুবক আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৯৩-এর এপ্রিল-মে মাসে সফর করেন উজবেকিস্তানে। সে দেশের বিজ্ঞ আলিম-ওলামার সাথে জিহাদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং তাজিকিস্তানের জিহাদকে কিভাবে আরও বেগবান করা যায়, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৯৩-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিখ্যাত সাংবাদিকদের সাথী হয়ে তিনিও দু'বার সফর করেন কেনিয়া, সুদান ও সোমালিয়ায়। স্বচক্ষে দেখেন তিনি এ অশান্ত দেশগুলোর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ ও উপকরণ।

একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারীতে নিয়মিত পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে দিল্লী হয়ে কাশ্মির পৌঁছেন। নববী আদর্শের পতাকাবাহী এই আপোসহীন মহান মুজাহিদের উপস্থিতি সহ্য হল না ব্রাহ্মণ্যবাদী জালিম শাসকদের। আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করে তারা তাঁকে বন্দী করল। তারা তাঁর হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল জিঞ্জির, স্তব্ধ করে দিল তাঁর অনলবর্ষী কণ্ঠ। অত্যাচার-নির্যাতনে রক্তাক্ত করল তার সমস্ত শরীর। অত্যাচারের এমন কোন ধরণ নেই, যা তারা তাঁর শরীরে প্রয়োগ করেনি। সেই থেকে তিনি বন্দী। প্রথমে ছিলেন কাশ্মির জেলে। এখন রয়েছেন দিল্লীর তেহার কেন্দ্রীয় জেলে। এখনও তাঁর উপর চলছে অমানুষিক নির্যাতন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং জেলমুক্তির দরখাস্ত জানাই পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে।

-অনুবাদক

হৃদয়ের আহবান

মুয়ায্যিনের আযান শুনে মসজিদে যাবার তাওফীক হয় সেই মুসলমানের, যাকে তার মহান মাবুদের প্রতি সিজদাহ করার নসীব ও তাওফীক দেয়া হয়।

মুজাহিদের আযান শুনার সৌভাগ্য হয় সেই ঈমানদীপ্ত মুমিনের, যে তার মাবুদের নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করে।

মাওলানা মাসউদ আযহার এখন জালিমের যিন্দানখানায় বন্দী। এই অকুতোভয় বীর মুজাহিদের আযানের ধ্বনি বহু পাঠকের কানে পৌঁছেছে মাসিক জাগো মুজাহিদের নিরলস প্রচেষ্টায়। সেই লিখাগুলি পুস্তকাকারে আপনাদের মুবারক হাতে তুলে দেবার প্রাণপণ ইচ্ছা আল্লাহপাক পূর্ণ করেছেন। তাঁকে শুকরিয়া জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই।

সাহিবুস সাইফ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মুসলমান মারা গেল অথচ দুনিয়ার জীবনে জিহাদের তামান্নাটুকুও তার ছিল না, সে এক প্রকার মুনাফিক অবস্থায়ই মারা গেল।' পাঠকের অন্তরে সেই তামান্নাকে জাগ্রত করার অদম্য স্পৃহার ফসল এই পুস্তিকার প্রকাশনা। দয়াময় আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

বিপদ-মুসিবতকে যাঁরা পাশ কেটে চলতে অভ্যস্থ নন, জিহাদের ছয়শতাধিক আয়াতের সরল অর্থ যাঁরা বুঝেন, আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দ্বীনকে গালিব করতে যাঁরা আন্তরিক, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁদের অন্তরকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হবে না 'মুজাহিদের আযান'।

দয়াময়ের প্রতি যার অকৃত্রিম ভালবাসা, যার অন্তর ঈমানের সৌরভে মোহিত, আল্লাহর পথে প্রবাহিত শোনিত যার বংশধারাকে জান্নাতের পথ দেখাবে, তার কান অহর্নিশি শুনতে পায় আকাশ-বাতাস মথিত করা বিশ্বব্যাপী এক আওয়াজ ঃ মুজাহিদের আযান।

কিউ জেড লস্‌কর
সাধারণ সম্পাদক,
জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

বিনীত নিবেদন

মুজাহিদের আযান। জিহাদ বিষয়ক এক অনবদ্য গ্রন্থ। সরাসরি কুরআন, হাদীস, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সংগ্রামী জীবন, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহাবীদের আপোসহীন কুরবানী ও কাফিরের মোকাবেলায় জীবনবাজি যুদ্ধ এর প্রধান উপাত্ত। মানবসৃষ্টি ও মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য কী, তারই সাবলীল ও পরিচ্ছন্ন বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এর প্রতিটি পাতায়, প্যারায় ও বাক্যে। শাব্দিক অর্থে নয়, নবী জীবন ও কুরআনী পরিভাষায় জিহাদ কাকে বলে তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলোতে। সুযোগ সন্ধানী, বাঁকা ও অপরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যার সামান্য প্রশ্রয় এখানে নেই। এতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ জিহাদ সম্পর্কে সকল অপব্যাখ্যার অপনোদন করা হয়েছে। প্রিয়নবী (সাঃ) ও সাহাবীদের জীবনব্যাপী অবিরাম যে যুদ্ধ চলেছিল ইসলাম বিরোধী সকল অপশক্তি ও কাফির মুশরিকদের সাথে সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, ফলাফল ও শিক্ষা শাণিত শব্দে উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে। আমরা বিশ্বাস করি, এ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার চোখে ভেসে উঠবে প্রিয়নবীর রক্তাক্ত শরীর ও ওহুদ, বদর ও হুনাইনের সংঘাতময় মুহূর্তগুলোর ভয়াবহ দৃশ্য। আপনার কানে অবশ্যই অনুরণিত হবে সেই শাণিত তরবারীগুলোর ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ। যে ময়দানগুলোতে জমে উঠত জীবন দেয়া-নেয়ার মজাদার খেলা। যেখানে বান্দা আপন আত্মা সমর্পন করে তারই মাবুদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। যে পথ স্পষ্ট, নিখাঁদ, চির অমলিন। যে পথে কামনা করেন আল্লাহ তাঁর প্রতিটি বান্দার সরব উপস্থিতি। এবং যে মঞ্জিল থেকে বেহেশ্তের দূরত্ব সবচেয়ে কম, সেই লোভনীয় উত্তম পথের সন্ধান পাবেন এই গ্রন্থে। মুজাহিদ আযান দিয়ে সে কথাই জানাতে চেয়েছেন সকল ঈমানদার মুসলিমকে। এ প্রসঙ্গে লেখকের সফল উপস্থাপনায় আমরা সত্যই অবিভূত। আমরা তার উভয় জীবনের কল্যাণ, সাফল্য ও জেলমুক্তি কামনা করি সর্বান্তকরণে। জানি না, আমার অদক্ষ হাতের কাঁচা অনুবাদ পাঠকের কাছে কেমন লাগবে। বিষয়টি ভাল বলে সাহস করেছি বই আকারে ছাপিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিতে।

উল্লেখ্য, এর মূল উর্দ্দু বইটি মাওলানা মাসউদ আযহারের বিভি়: বক্তৃতার সংকলন। দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃটেন ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সভাসমাবেশ থেকে বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল এ বক্তৃতাগুলো। মূল সংকলনটি দু'খন্ড। নাম 'খুতুবাতে মুজাহিদ'। আমরা এর উভয় খন্ড থেকে পাঁচটি বক্তৃতা চয়ন করে 'মুজাহিদের আযান' নামে প্রকাশ করছি। এর সর্বশেষ অধ্যায়টি শহীদ ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যামের একটি অসীয়াতনামা। অত্যন্ত জরুরী বিষয় বলে সেটি আমরা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করলাম। আশা করি পাঠক উপকৃত হবেন, এর মর্ম উপলদ্ধি করে সাহাবী চরিত্রের ত্যাগী জীবন গঠনে নবউদ্দমে অনুপ্রাণিত হবেন। এ বই পড়ে পাঠক আপন সংক্ষিপ্ত জীবনকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর পথে সোপর্দ করবেন। এই উদ্দেশ্য ও আশা নিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম 'মুজাহিদের আযান'।

এর 'জিহাদ ত্যাগ করার পরিণাম' ও 'আলিম সমাজের দায়িত্ব' অধ্যায় দু'টির প্রাথমিক অনুবাদ করেছিলেন নবীন লেখক স্নেহাস্পদ মাওলানা আসাদ বিন মাকসুদ। চূড়ান্ত পরিশোধিত আকারে সে দু'টি অধ্যায় এ সংকলনে সংযোজিত হল। শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যামের অসিয়াতনামাটির অনুবাদ করেছিলেন মাওলানা ইউসুফ বিন নূর। এ প্রসংগে জাগো মুজাহিদের সার্কুলেশন ম্যানেজার মাওলানা মুহিউদ্দীনের কথা উল্লেখ করতে বাধ্য। এক কথায় তার অকৃত্রিম সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এ বইটি পাঠকের মুখ দেখল। আল্লাহ এদের সবাইকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন।

হয়ত বহু ভুল রয়েছে এ বইতে। সুহৃদ পাঠক ভুলগুলো চিহ্নিত করে আমাদের অবহিত করলে অত্যন্ত উপকৃত হব। এ বই আমাদের সকলের শাহাদাত অনুপ্রেরণার উৎস হোক এই কামনায় –

মনযূর আহমাদ
সম্পাদনা সচিব
জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

সূচীপত্র

- জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ ১৫
- প্রিয়নবীর (সাঃ) ইনকিলাব ৫৩
- জিহাদের বায়'আত ৬৭
- জিহাদ ত্যাগ করার পরিণাম ১১১
- আলিম সমাজের দায়িত্ব ১৩৫
- শহীদ আব্দুল্লাহ্ আয্যামের অমর অসীয়াতনামা ১৪৯

জিহাদের গুরুত্ব তৃপ্তি ও স্বাদ

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

যে বিষয়ের সম্পর্ক কুরআন ও হাদীসের সাথে এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত, তা বুঝতে বিলম্ব করা ও গ্রহণ করতে সংশয়ের শিকার হওয়া অবশ্যই এক দুর্ভাগ্যের কথা। তাই বলছি, ইসলামে জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সম্পর্কে কুরআনে রয়েছে বহু আয়াত এবং প্রিয়নবী (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদীস। মহানবী (সাঃ) নিজে বহু জিহাদে শরীক হয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদের প্রতি সাহাবীগণের এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তাঁরা শুনলে হত, জিহাদের ডাক পড়েছে। ব্যস সব কাজ ছেড়ে সব কাজ পেছনে ফেলে দৌড়ে একে অপরের আগে জিহাদে যোগদান করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। যুদ্ধ জয় করে আল্লাহর দ্বীনের সুরক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে তাঁরা ছিলেন অকৃত্রিম।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এক সভায় হাদীস শুনাচ্ছিলেন। তখন তিনি বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

"জেনে রেখো! বেহেশত তরবারীর ছায়ার নীচে।" (বুখারী শরীফ, ১ম খঃ, পৃঃ ৩৯৫)।

তাঁর মুখে এই হাদীসখানা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন, যার বদন ছিল মলিন, বসন ছিল অপরিচ্ছন্ন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মূসা! আপনি কি নিজ কানে প্রিয়নবীর মুখ থেকে এই কথা শুনেছেন? হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজ কানে শুনেছি। ব্যস, লোকটি বুঝে নিলেন, প্রিয়নবীর এ কথার উদ্দেশ্য কি।

মুহাদ্দিসগণ إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ এই হাদীসের

ব্যাখ্যায় বলেছেন, ভয়াবহ সংঘাতময় কঠিন যুদ্ধে শরীক হওয়ার কথা এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যখন পরস্পরের তরবারীর আঘাতের ঝনঝন শব্দে পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠে, যখন শুধু একে অপরকে কুপোকাত করার চেষ্টায় সকল শক্তি ও কৌশল নিয়োজিত করে, তখন সত্যই এক লোভনীয় ও নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর তখনই জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে মুসলমান যুদ্ধে শাহদাত বরণ করে তখনই তাকে সোজা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন কাফের নিহত হলে কঠিন জাহান্নামে নিক্ষেপিত হয়।

যা হোক, লোকটি এ হাদীসখানা শোনার পর সভা থেকে উঠে তখনই যুদ্ধের ময়দানে চলে যান এবং কাফিরদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সাহাবীগণ বলেছেন, ঐ লোকটি আর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেননি। ফিরে এসেছে তার লাশ।

সাহাবীদের জীবন ও চিন্তায় একটি মাত্র হাদীসের প্রতিক্রিয়া ছিল কত গভীর! যখন শুনেছে তখনই জিহাদে যোগদান করেছে। শহীদ না হয়ে আর ঘরে ফিরেনি। জীবনের লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসিতার ছিটেফোটাও তাদের জীবনে ছিল না। তাদের চিন্তা ও পরম উদ্দেশ্য ছিল আখেরাতের সফলতা। তাই তারা অপকটে জীবন দিতে জিহাদে ছুটে যেতেন।

হাদীসের কিতাবে এমন কয়েকজন সাহাবীর কথাও উল্লেখিত হয়েছে, যারা ঈমান গ্রহণের পরক্ষণেই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং ঐ জিহাদেই শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) তখনই তাদের জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষণা করেন এবং বলেন, অতি অল্প সময় তারা সৎ আমল করেছে; কিন্তু তারা লাভ করেছে মহাপুরস্কার।

'জমউল ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, (ইমাম বুখারীও কিতাবুল জিহাদে প্রায় অনুরূপ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন) যুদ্ধের ময়দান থেকে কোন এক কাফের সামনে বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে, কে আছ আমার মোকাবেলায় যুদ্ধ করার সাহস রাখ! এই চ্যালেঞ্জ শুনে এক মুসলমান তার সাথে দ্বৈরথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কাফির বিজয়ী হয়। অপর এক মুসলমান তার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। তিনিও শহীদ হয়ে যান। এরপর লোকটি বিজয়ের উত্তেজনায় ঘোড়া দৌড়িয়ে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ

করছেন? প্রিয়নবী (সাঃ) তাকে বলেন, "আমি এ জন্য লড়ছি, যেন সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বিজয়ী হয়। সকল মানুষ যেন আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত হয়।"

লোকটি বলল, এতো চমৎকার কথা। আমিও কি পারব আপনার দলভুক্ত হতে? প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পার। লোকটি তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়ল এবং মুসলমান হয়ে গেল। অতপর বিলম্ব না করে সে মুসলিম পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রচণ্ড বেগে কাফির বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে এবং এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে যায়।

যে লোকটি একটু আগে কাফিরদের পক্ষ হয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিল, অল্প আগে ঈমান গ্রহণ করে ঐ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হয়ে বিপুল সাহসিকতার সাথে কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে যায়। আল্লাহর নবী (সাঃ) তাকে ময়দান থেকে তুলে আনেন এবং কাফির পক্ষে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার আঘাতে যে দু'সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাদের সাথেই তাকে দাফন করেন। আর বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক এদের মনে পরস্পরের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। অথচ ঐ ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও সুযোগ ঘটেনি। একটি সেজদা দেয়ার সৌভাগ্যও তার হয়নি। কিন্তু জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাত বরণের ফলে তার জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ আছে কি?

জিহাদী কাফেলার মনোরম দৃশ্য

বর্ণিত হয়েছে, এক যুদ্ধে সাহাবীগণ রওনা হয়েছেন। জনৈক নজদী বদ্দু তাদের সাথে মিলিত হয়। সে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? জবাবে বলা হল, আমরা জিহাদে যাচ্ছি। আমাদের নবীও আমাদের সাথে আছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, গনীমাত ইত্যাদি তো পাবে? সাহাবীগণ বলেন, অবশ্যই পাব ইনশাআল্লাহ।

যুদ্ধে বিজয় লাভ হলেই কেবল তখন গনীমাত পাওয়া যায়। কিন্তু সাহাবীগণের বিশ্বাস ছিল, তারা বিজয় অর্জন করবে এবং অবশ্যই তারা গনীমাত পাবে। যুদ্ধ জয়ের অটুট মনোবল নিয়ে তারা জিহাদে অবতীর্ণ হতেন। পরাজয় বরণের চিন্তা আদৌ তাদের স্পর্শ করত না। তারা কখনোই পরাজয় বরণের দুর্বলতায় ভুগতেন না। তাই তাদের চেহারায় ফুটে উঠতো বিজয়ের দ্যোতি। সবচেয়ে মনোরম ছিল যুদ্ধে যাওয়ার

কাফেলার দৃশ্য, যে সুশৃঙ্খল দৃশ্য দেখে কাট্টা কাফেরের মনও উদ্বেলিত হত।

আল্লাহর শুকরিয়া। আফগান রণাঙ্গনে জিহাদী কাফেলার সেই হৃদয়-আপ্লুত দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার বহুবার হয়েছে। এ তো হিজরী পনের শতকের জিহাদ। তারই দৃশ্য যখন এত হৃদয় আপ্লুত করে, না জানি প্রিয়নবীর জিহাদী কাফেলাসমূহের দৃশ্য কত মনোরম ছিল।

ক্যাম্পে কেউ একাগ্রচিত্তে নামাযে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ সিজদায় পড়ে বিজয় অর্জন ও শাহাদাত লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে মিনতি জানাচ্ছে, কাঁদছে। কেউ কুরআন তেলাওয়াত করছে।

আমীর সাহেব ডেকে বলছেন, আজ অমুক অমুক যুদ্ধে যাবে। যাদের নাম ডাকা হয়েছে, খুশীতে তাদের চেহারা জ্বলছে। যাদের নাম ডাকা হয়নি, যারা ক্যাম্পে থেকে যাচ্ছে, তাদের চেহারায় মলিনতার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। যে সকল ভাগ্যবানের নাম ডাকা হয়েছে, যারা এখনই শত্রুর মোকাবেলায় রওয়ানা হয়ে যাবে, তারা নিঃসীম জযবায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনই তারা ফেটে পড়বে শত্রুর মোকাবেলায়। কাঁধে ক্লাসিনকভ, কোমড়ে মোটা ও শক্ত বেল্ট। দুনিয়ার সব আনন্দ বুকে নিয়ে তারা সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। ক্রমানুসারে যুদ্ধের জন্য যাদের নাম এখনও আসেনি, তারা যুদ্ধ কাফেলার সামানপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে, তাদের ম্যাগজিনে গুলী ভরে দিচ্ছে, তাজা বুলেটের মালা গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। তাদের কানে কানে বলছে, তুমি যদি শহীদ হয়ে যাও, তবে কেয়ামতের দিন আমাকে ভুল না কিন্তু। কঠিন কিয়ামতের দিনে অবশ্যই আমার সুপারিশ করবে বন্ধু।

কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। সকলে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মিনতি করে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিজয় দান কর। তোমার সাহায্য আমাদের একমাত্র ভরসা। তোমার করুণার নজর ছাড়া আমরা এক পা এগুতে পারব না। ইয়া আল্লাহ.......। কান্নার আওয়াজ বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে।

মুনাজাত শেষে নিনাদ কাঁপন তাকবীর ধ্বনি দিয়ে কাফেলা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পে রয়ে যাওয়া সাথীরা ঈর্ষার নজরে তাদের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সামনে অগ্রসরমান মুজাহিদ কাফেলা খুশীর জোয়ারে ভাসছে। সাফল্য ও সৌভাগ্যের সোপান বেয়ে শাহাদাতের শীর্ষ

চূড়ায় পথ দিয়েছে। শত্রু বাহিনীর বিমান উপর থেকে বোমা নিক্ষেপ করছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, তারা নির্ভীক, তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে– 'আল্লাহর সহায় আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থাপক।'

তাদের হৃদয়ে ঈমানের জ্যোতি, মুখে আল্লাহর যিক্‌র। জীবন দেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে,চতুর্দিক থেকে শত্রু বাহিনীর বুলেট আসছে- তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক শত্রু-পরিখা দখল করছে। এ যে কি আনন্দের বিষয়, তা শত্রু মোকাবেলায় অবতীর্ণ মুজাহিদ ছাড়া কে বুঝবে?

মান্যবর এক মুফতী সাহেব আমাদের সাথে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন, সাগ্রহে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। নিজ হাতে শত্রুর দিকে তোপ নিক্ষেপ করেছেন। শত্রু বাহিনী তার তোপের জবাবে আমাদের দিকে ভারী তোপ ছুড়ে দিয়েছে। খেলা জমেছে। তৃপ্তি ও খুশীর আতিশয্যে মুফতী সাহেব বললেন ঃ

"আমি লাগাতার বিশ বছর হজ্ব করেছি, শত শত বার আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেছি, অসংখ্যবার নবীর (সাঃ) রওযা জেয়ারত করেছি, তাঁর প্রেমে আবেগাপ্লুত হয়েছি; কিন্তু এই ক'মিনিটে আত্মায় যে স্বাদ ও তৃপ্তি আমি উপলব্ধি করলাম, তার কোন তুলনা হয় না।"

এ কোন অতিশয়োক্তি নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "যদি রাতটি কদরের হয় এবং আমি হাজ্‌রে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে সে রাতে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হই, তার চেয়ে অতি উত্তম মনে করি জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের পাহারাদারী করাকে। কেননা প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহর পথে দৃঢ়পদে এক ঘন্টা যুদ্ধ করা কদরের রাতে হাজ্‌রে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে রাতভর ইবাদত করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম।"

আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আখ্‌তার মাহমুদ। বয়স আনুমানিক বিশ বছর। ছোট ভাইয়ের মতো সকলে তাকে ভীষণ আদর করত। করাচী থেকে জিহাদের ময়দানে রওয়ানার সময় তার অবয়ব এক অপার্থিব জ্যোতির ঝলকে জ্বলত। সকলে তার দিকে অবাক তাকিয়ে দেখত।

একবার গরদেজ রণাঙ্গনে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানার সময় নূরের জ্যোতিতে ঝলসে উঠছিল তার চেহারা। মনে হচ্ছিল তার সম্পূর্ণ

শরীর যেন নূরের এক উজ্জ্বল টুকরো। মিষ্টি আমেজে জ্বলজ্বলে আভা-আলো বিকিরিত হচ্ছে সমস্ত উপত্যকায়। এই বেহেশতী মানুষটিকে নয়নভরে সকলে দেখছে, দ্বিতীয়বার তার সাথে দেখা হবে কিনা কে জানে! উপস্থিত মুজাহিদ বন্ধুরা তার নিকট বিনীত অনুরোধ করে বলছে, 'ভাই আখ্‌তার! যদি শহীদ হয়ে যাও তবে কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে অবশ্যই সুপারিশ করবে।'

প্রচন্ড শীত বইছে। সমস্ত উপত্যকা বরফে ঢেকে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সে গোসল করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, প্রচন্ড ঠান্ডা বরফ-পানিতে তুমি কেন গোসল করছ? বলল, 'মনে হচ্ছে আগামীকাল আমার আনন্দঘন বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।'

এ ঘটনার পরের দিন শত্রু বাহিনীর উপর বড় ধরনের এক আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল। সে এই অপারেশনে অংশ নেয়। এক পর্যায়ে বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে শাহাদত লাভে ধন্য হয়। পরম প্রাপ্তি ও আনন্দের হাসি হেসে নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে অনন্ত জগত জান্নাতের পথে যাত্রা করে। সত্যিই পরদিন তার শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এ জগতের কোন তন্বী তরুণীর সাথে নয়, জান্নাতের হুরদের সাথে তার মধু মিলন ঘটেছিল। এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে বলুন।

যাই হোক, সাহাবীদের সাথে ঐ লোকটি– নজদী বদ্দু গনীমাত প্রাপ্তির আশায় রণাঙ্গনে চল্‌ল। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিল না, কিভাবে এদের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করবে, সে তো ভিন্ন বিশ্বাসের লোক। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে ঈমান গ্রহণের আকাঙ্খা জাগে। সে মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করে। এবার সে চিন্তা করে, আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি। এখন থেকে প্রিয় নবী (সঃ)-এর নিকটে নিকটেই থাকব। এদিকে সাহাবীগণ অজানা আশংকায় ভাবছেন, লোকটি মুসলমান নয় অথচ প্রিয়নবী (সঃ)-এর এতো নিকটে থাকছে কেন? এর মধ্যে প্রিয়নবী (সঃ) জেনে ফেলেছেন যে, লোকটি মনে মনে কলেমা পড়ে ইসলামে দিক্ষীত হয়েছে।

সাহাবীগণের উপরোক্ত মনোভাব বুঝে প্রিয়নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন, তাকে আমার নিকটে আসতে দাও। এ লোক তো বেহেশতের এক সম্রাট।

অতঃপর লোকটি কাফিরদের মোকাবেলায় প্রচন্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মারাত্মক আহত অবস্থায় মাটিতে তড়পাতে থাকে। কিছুক্ষণ পর নবী (সঃ)

সাহাবীগণকে বলেন, লোকটির অবস্থা কি দেখে এস। তারা তার মারাত্মক আহত অবস্থা দেখে এই কথা ভেবে ভীষণ চিন্তাণ্বিত হন যে, লোকটি ঈমান গ্রহণ না করে আহত হল এবং এই অবস্থায় সে মরে যাবে? ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য তার হল না! এবার তারা লোকটির কাছে গিয়ে জানতে চাইল, হে লোক! তুমি কি গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছ, না গনীমাতের লোভে যুদ্ধ করেছ, না একান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যুদ্ধ করেছ? সে বলল, আল্লাহর কসম! একমাত্র আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কলেমা বুলন্দ করার নিয়্যাতে আমি যুদ্ধ করেছি। এ কথা কয়টি উচ্চারণ করার পর লোকটি সেখানেই শাহাদাত বরণ করল।

প্রিয়নবী (সঃ) নিজ হাতে তার শবদেহ কবরে রেখে দেন। তখন রাসূল (সঃ)-এর চেহারায় খুশীর জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সাহাবীগণ তাঁর এই অস্বাভাবিক আচরণে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কেউ বুঝতে পারছেন না, হঠাৎ তাঁর এ অস্বাভাবিক আচরণের হেতু কি? কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), কেন আপনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন? প্রিয়নবী (সঃ) বললেন, তার হুর সকল এসে পড়েছিল। তাই আমি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছি। (আত-তারগীব অত-তারহীব ঃ কিতাবুল জিহাদ)।

কিছুক্ষণ পূর্বে লোকটি মুসলমান হয়েছে, অন্য কোন ইবাদত করার তাওফীক তার হয়নি, অথচ কত উঁচু মর্যাদা ও অকল্পনীয় পুরস্কার তার ভাগ্যে হল। এর দ্বারা জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা কত বেশী তা আমাদের বুঝে নেয়া দরকার।

জিহাদের ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয় বিফলে যাওয়ার আশংকা নেই। কাউকে হত্যা করাও সওয়াব, নিজে নিহত হলে তো সোজা জান্নাত। শত্রুর গোলায় নিহত হলেও জীবন সার্থক এবং ভুলবশতঃ কোন সহযোদ্ধার গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেও কামিয়াব। বিফল ও ব্যর্থতার কোন আশংকা জিহাদে নেই।

জিহাদের মর্যাদা

জনৈক সাহাবী বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এ খবর শুনে তার মা উম্মে হারেস ময়দানে ছুটে এসে সব দেখে-শুনে হুযূর (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ রাসূল (সঃ)! আমার সন্তান কোন্ পক্ষের আঘাতে শহীদ হয়েছে তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। যে তীরটির

আঘাতে সে শহীদ হয়েছে সেটি কোন কাফির নিক্ষেপ করেছিল, না কোন মুসলমানের নিক্ষেপিত ছিল তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না। এখন তার পরিণাম কি হবে? সে যদি জান্নাতবাসী না হয়, তবে আমি কাঁদব। তার দুর্ভাগ্যের জন্য অবশ্যই কাঁদব। একথা শুনে রাসূল (সঃ) মহিলাকে বললেন ঃ

وَاِنَّ اِبْنَكَ اَصَابَ الفِرْدَوْسَ الاَعْلٰى

'কি বলছ তুমি! সে তো এখন জান্নাতুল ফেরদাউসে অবস্থান করছে।' (বুখারী-খ ঃ ১, পৃ ঃ ৩৯৪)

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে এক সাহাবী বলেন, ঐ যুদ্ধের এক পর্যায়ে আমার মামা এক ইয়াহুদীর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন। মামার তরবারীখানা কিছুটা ছোট ছিল। তিনি ইয়াহুদীর উপর হামলা করলে ইয়াহুদী পেছনে সরে যায়। তিনি আক্রমণ সামলাতে না পারার ফলে আপন তরবারীর প্রচন্ড আখাতে তার পা মারাত্মক যখম হয় এবং কিছু পরে শাহাদাত বরণ করেন।

এ ঘটনার পরে কেউ কেউ বলছিল, লোকটি নিজের তরবারীর আঘাতে মারা গেল! কাফেরের আঘাতে মারা গেলেই তো তাকে শহীদ বলা হয়– তিনিই লাভ করেন শাহাদাতের সুউচ্চ আসন। এ লোকটির ভাগ্যে তো তা ঘটল না।

তার আপন মামা সম্পর্কে লোকদের এ মন্তব্য হজম করা তার পক্ষে বড় কষ্টকর ছিল। সে ভাবছে, আমার শাহাদাত বরণকারী মামার ব্যাপারে এ লোকগুলো কি বলছে! তবে আসলেই কি আমার মামা শহীদের মর্যাদা লাভ করেননি?

প্রিয়নবী (সঃ)-এর নিকট যেয়ে একথা বললে তিনি তাকে বলেন, 'সাধারণ শহীদের চেয়ে তোমার মামা দ্বিগুণ মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করেছে ঃ

এক. শাহাদাতের সওয়াব,

দুই. লোকেরা তার ব্যাপারে যে অমূলক মন্তব্য করেছে তার বদলায় আরো একটি শাহাদাতের সওয়াব আল্লাহ তাকে দান করেছেন।'

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর আব্বা ঋণসহ ছয়টি অবিবাহিত যুবতী মেয়ে ঘরে রেখে জিহাদে যোগাদান করেন এবং শাহাদাত লাভে ধন্য হন। অতপর হযরত জাবের (রাঃ) এসে প্রিয়নবী

(সঃ)কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার আব্বা শাহাদাত বরণ করেছেন, তিনি এখন কোন্ অবস্থায় আছেন? প্রিয়নবী (সঃ) বলেন ঃ

كَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا

তোমার আব্বার অবস্থা হল, আজ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কারও মুখোমুখি হয়ে কথা বলেননি, কিন্তু তিনি তোমার আব্বার সামনে এসে তার সাথে কথা বলেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তোমার মন কি চাচ্ছে বল? তোমার আব্বা বলল, হে আল্লাহ! আমার মন চাচ্ছে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হোক। শহীদের মর্যাদা, শহীদী মৃত্যুর স্বাদ ও আস্বাদ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে আমি জানিয়ে আসি। আল্লাহ বললেন ঃ

سَبَقَ مِنِّى اَنَّهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ

- পুনরায় ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ ছাড়া অন্য কোন আকাঙ্খা থাকলে বল।

শাহাদাতের স্বাদ

শাহাদাতবরণ করার সময় কোন মুজাহিদকে ব্যথ্যা ভারাক্রান্ত মলিন চেহারায় দেখিনি, মৃত্যুবরণ করার সময় প্রত্যেক শহীদের চেহরায় হাসি ও খুশীর আবেশ লক্ষ্য করেছি। হাসি হাসি মুখে তারা শাহাদাতকে বরণ করে নিয়েছে। কখনও কোন শহীদের চেহারায় দুশ্চিন্তা ও দুঃখের ছাপ দেখিনি।

এক মুজাহিদ মারাত্মক আহত হয়েছিল। সাথীরা তাকে কোলে তুলে বলল, শেষ অসীয়াত স্বরূপ আমাদেরকে কিছু বলার আছে কি? সে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার শেষ অসীয়ত হল, 'বন্ধুরা! কখনও জিহাদ ত্যাগ করবে না।'

এক আরব মুজাহিদ আফগানিস্তানের জালালাবাদ রণাঙ্গনে মারাত্মক আহত অবস্থায় সকল সাথীকে ডেকে বলছিল, জলদি আমার কাছে এস, সকলে এস। সাথারী তাকে ঘিরে জমায়েত হল। বলল, আমি দোয়া করব, তোমরা সকলে আমীন বলবে। সে দোয়া করল, 'হে আল্লাহ! এদের সকলকে সেই মৃত্যু দান কর, যে মৃত্যু তুমি আমাকে এখনই দান করছ। সকলে আমীন বলল। এদিকে তার প্রাণ পাখি উড়ে জান্নাতে চলে গেল। জানি না সে কি দেখছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে, কত স্বাদজনক মৃত্যুবরণ করতে সে তার সাথীদের জন্য দোয়া করে গিয়েছিল। শহীদী মৃত্যু যে কত স্বাদ ও আনন্দের তা একথা দ্বারা আন্দাজ করা যায়। শহীদ

ব্যক্তি বেহেশতে যেয়েও শাহাদাতের স্বাদের কথা ভুলবে না। সে জান্নাতে বসবাস করেও আল্লাহর নিকট আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে, তাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করে দ্বিতীয়বার শাহাদাতবরণ করার সুযোগ করে দিতে। প্রিয়নবী (সঃ)-ও এই আকাঙ্খা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে শাহাদাতবরণ, আবার জীবন দান, আবার শাহাদাত বরণ নসীব করুন।'

জিহাদে যোগদান করা থেকে অলসতা প্রদর্শন

এক হল জিহাদের মহত্ত্ব, এক হল জিহাদের অপরিহার্যতা, আর হল জিহাদের গুরুত্বের কথা। দুঃখজনক বিষয় হল, রণাঙ্গন ছেড়ে আজ দেশে দেশে আমাদেরকে ঘুরতে হচ্ছে, জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে বুঝানো তো পরের কথা, জিহাদ কাকে বলে, তাই লোকেরা জানে না। অথচ জিহাদ এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির ও তাফ্সীর লেখক বলেছেন, কুরআন পড়লে মনে হয় জিহাদই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। কোন মুফাস্সির একথা লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে তাওহীদ বিষয়ক আলোচনার পরে জিহাদ নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচনা করা হয়েছে।

সেকালের প্রত্যেক মুসলিম কিশোর-তরুণও জিহাদকে গভীরভাবে বুঝত। তারা গভীর বিশ্বাস, আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে প্রিয়নবী (সঃ)কে বলত, হে আল্লার রাসূল (সঃ)! আমাদেরকেও জিহাদে নিয়ে/ চলুন। তারা জিহাদে যোগদানের সুযোগ ও সৌভাগ্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় পরস্পরে কুস্তি লড়ত। আজকের মুসলিম কিশোরদের কথা ত আলাদা, যুবকরাও জানে না জিহাদ কাকে বলে। সেকালের মহিলারাও জিহাদের গুরুত্ব বুঝত, প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করত। হযরত খাওলা (রাঃ) সিরিয়া বিজয় প্রাক্কালে এক রণাঙ্গনে শত্রু বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ তিন কমান্ডারকে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে হত্যা করেছিলেন। এই জিহাদ আজকের মুসলিম পুরুষরাও বুঝে না। তাই প্রথম বুঝতে হবে জিহাদের অর্থ কি? জিহাদের উদ্দেশ্য কি? এবং জিহাদ-যুদ্ধ বলতে কি বুঝায়?

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর বিষয় হল, লোকেরা জিহাদের ব্যবহারিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করছে না। যে কারণে বক্তা তার বক্তৃতাকে জিহাদ বলে চালিয়ে দিচ্ছে, লেখক তার লেখাকেও জিহাদ বলছে, শ্রমিক তার মেহনতকে জিহাদরূপে অবহিত করছে, যে মহিলা

বাচ্চা প্রতিপালনের দায়িত্বে নিয়োজিত সেও নাকি জিহাদ করছে।

বুঝে আসছে না, মুসলিম উম্মাহ এভাবে বহুমুখী জিহাদে নিয়োজিত রয়েছে, অথচ দিন দিন আমাদের সম্মান হ্রাস পাচ্ছে, অপমান ও বঞ্চনার কষাঘাতে জাতি নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জিহাদ তো কখনোই বঞ্চনা ও অপমান ডেকে আনে না! জিহাদ অবশ্যই সম্মান বৃদ্ধি করে। উপরন্তু জিহাদ মুসলমানকে সম্মানের শীর্ষস্থানে উন্নীত করে, জিহাদের বরকতে তাদের হাতে নেতৃত্ব আসবে। অথচ তাদের জিহাদে এসব তো লাভ হচ্ছে না।

সবাই নিজেকে মুজাহিদ দাবী করছে। মুজাহিদ হওয়ার দাবী ত্যাগ করতে কেউ রাজী নয়। সভা-সমাবেশের ময়দান ও ঘরের মেঝেকেও তারা রণাঙ্গন হিসেবে আখ্যায়িত করে। যদি এসব লোক মুজাহিদ হয় এবং এসব জায়গা রণাঙ্গন হয়, তবে দিন দিন মুসলিম জাতি সম্মান, সামর্থ ও নেতৃত্বহীন হচ্ছে কেন? বহু জনপদে আজ মজলুম মুসলিমের আহাজারী ও কান্নার রোল শুনা যাচ্ছে কেন? কিভাবে জালিম-কাফিরেরা তাদের মুন্ডু কেটে পাহাড় গড়ার সাহস পাচ্ছে? ইসলাম বিরোধী শক্তি সত্যিকার মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, মসজিদ ভেঙ্গে দিচ্ছে, মাদ্রাসা, খানকা ও দাওয়াতী কেন্দ্রসমূহে কেন তালা ঝুলছে? কেন জেলখানাগুলোয় আজ আল্লাহ-নিবেদিত মুমিন বান্দারা ধুকে ধুকে মরছে? কোন্ সাহসে তারা কুরআন-হাদীস জ্বালিয়ে দিচ্ছে, প্রিয়নবী (সঃ)কে চরম অপমানিত করা হচ্ছে? বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছে, প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা এখনো ইয়াহুদীদের দখলে। বুঝে আসছে না তারা কেমন জিহাদ করছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ যে ইবাদতের বেলায় যে নাম ব্যবহার করেছেন, তাকে সে নামে অবিহিত করা উচিত। এর ব্যতিক্রম করা অন্যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, জিহাদ ঈমানের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। ফকীহগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদকে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, কোন লোক যদি সাধারণ একটি সুন্নাতকেও তাচ্ছিল্য করে, তবে তার ঈমান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার ঈমানহারা হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

মেসওয়াক করতে দেখে কেউ যদি তাচ্ছিল্য করে বলে, মেসওয়াক করছ? তবে তার ঈমান সংকটাপন্ন অবস্থার মুখোমুখী হবে। অতএব কেউ যদি ফরয জিহাদ সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলে, তবে তার ঈমান থাকবে

কি? বিজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিন, ইসলামে জিহাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব কত অপরিসীম।

জিহাদ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন

আপনি যদি জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনকে প্রশ্ন করেন, তবে দেখবেন, খণ্ডিত-সমগ্র, ছোট-বড় যে কোন জবাব আপনি পাচ্ছেন।

কুরআন মজীদকে প্রশ্ন করুন, বল জিহাদের হুকুম কি? এর জবাবে সে স্পষ্ট বলবে-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

'তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে' (সূরা ঃ বাকারা - আয়াত ২১৬)।

যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়, বল, আমরা জিহাদ করলে কি মর্যাদা পাব আল্লাহর কাছে?

সে বলবে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهٖ صَفًّا

'আল্লাহ তাঁদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে।' (সূরা ঃ আস-সফ - আয়াত ৪)

বল, হে কুরআন! কতদিন আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে?

পবিত্র কুরআন বলবে –

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ

'তোমরা যুদ্ধ কর যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে ফেতনা-ফাসাদ সাকুল্যে নির্মূল হয়।' (সূরা ঃ আনফাল ঃ আয়াত -৩৯)

বল, এতে আমাদের কি উপকার হবে?

সে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলবে, এতে ছয়টি উপকারিতা রয়েছে ঃ

এক.

وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ

'যুদ্ধ কর ওদের সাথে আল্লাহ তোমাদের হাতে ওদের (ইসলাম বিরোধীদের) শাস্তি দেবেন।'

দুই.

وَيُخْزِهِمْ

'আল্লাহ ইসলাম বিরোধী কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন।'

তাদের কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি অবশিষ্ট থাকবে না, থাকবে না তাদের কোন মাতব্বরী ও দাপট। তারা জীবন যাপন করবে চরম অবমাননাকর।

তিন.

وَيَنْصُرْكُمْ

'তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন।'

আল্লাহর নির্দেশে তোমাদের বিজয় বরণে সাহায্য করবে বাতাস, পশুপাখী ও ফেরেশতাসহ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু।

চার.

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ

'মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।'

তোমাদের হৃদয় শান্ত হবে। আজ যে মা-বোনেরা আরকান ও কাশ্মিরে কাঁদছে, যাদের ইজ্জত বুড্ডিস্ট ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হায়েনারা লুটছে, যারা স্বাধীনতা হারিয়ে পরদেশের রিফুজী ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছে, তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আপন আলয়ে ফিরে যাবে, নিজেদের হাতে ক্ষমতা আসবে। সকল প্রকার জুলুম অপসারিত হয়ে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে-যদি তারা জালিমের মোকাবেলায় সাহসে বুক বেঁধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এছাড়া আযাদী ছিনিয়ে আনা এবং সম্মান ও ইজ্জত সুরক্ষার কোন বিকল্প পথ নেই।

পাঁচ.

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ

'এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন।'

তোমাদের বুকে জমায়িত সকল রাগ ও ক্ষোভ কাফেরের উপর পতিত হবে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলে যাবে। বিজয়ী মুসলিম শক্তি একে অপরকে ভাইরূপে বরণ করে নেবে। সৃষ্টি হবে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পরম পারাকাষ্ঠা।

ছয়.

وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ

'এবং আল্লাহ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন।'

(সূরা ঃ তওবা ঃ আয়াত - ১৪)

বল, হে কুরআন! যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অন্যদের তুলনায় আমাদের কী পরিমাণ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে?

কুরআন বলছে ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

'যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। উম্মতের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তাদের মর্যাদা বহুগুণে বেশী।'

অনেক বেশী মর্যাদার কথা শুনলাম, কিন্তু তা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা আছে কি?

তাদের যুদ্ধে অবতরণের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং পুরস্কারের গ্যারান্টি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা শপথ করে বলেছেন ঃ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا

'শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। অতপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরিত অশ্বসমূহের।'

এরপর আর পুরস্কার প্রাপ্তিতে সন্দেহের অবকাশ থাকে কি?

হে কুরআন! এবার বল, ইসলাম বিরোধী কাফিরদের সাথে আমরা লড়ব, তবে এর কোন্ অংশের উপর প্রথম আঘাত হানব?

সে বলছে ঃ

وَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

'তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে।' (সূরা ঃ আন-নিসা ঃ আয়াত - ৭৬)

এবং

فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ

'কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।'

অর্থাৎ প্রথমে তাগুদের এজেন্টদের সাথে এবং কাফির নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর।

হে কুরআন বল, রণাঙ্গনে আমরা কিভাবে যুদ্ধ লড়ব?

পবিত্র কুরআন বলছে ঃ

إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

'তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক।'

কিভাবে আমরা দুঢ়পদ থাকব? সম্মুখ দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা-বারুদ আসছে, উপর থেকে বোমা নিক্ষেপিত হচ্ছে, পায়ের তলা থেকে মাইন বিস্ফোরিত হচ্ছে, তখন?

পবিত্র কুরআন বলছে ঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

'তখন আল্লাহকে স্মরণ কর।'

তিনিই বোমা, বিমান ও মাইনকে অকেজো করে দেবেন।

হে কুরআন! রণাঙ্গনে যদি আমরা নিহত হই, তবে কি আমরা মরে যাব, লোক আমাদেরকে কি মৃত বলবে?

না, তোমাদেরকে মৃত বলতে বারণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন ঃ

وَلَاتَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰه أَمْوَاتٌ

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বল না।' (সূরা ঃ বাকারা ঃ আয়াত - ১৫৪)

উপরন্তু এদেরকে মৃত ধারণা করতেও নিষেধ করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ امْوَاتًا

'আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখন মৃত মনে কর না।'

কুরআনকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা জিহাদে নিহত হলে কি আমাদের আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে?

না -

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

'যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্মবিনষ্ট করবেন না।'

কবরবাসী হয়েও তারা শাহাদাতের বরকতে সওয়াব পেতে থাকে।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা জিহাদ না করলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে?

কখনই নয়।

তবে

اِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذابًا اَلِيْمًا

'যদি জিহাদে বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন।' (উপরন্তু) এবং

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।' (সূরা ঃ তাওবা - আয়াত ৩৯)

এই অপর জাতির বৈশিষ্ট্য কি হবে?

তাদের বৈশিষ্ট হবে ঃ

اَذِلَّةٍ عَلى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلى الكافِرِيْنَ

'তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয় নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে।' (সূরা ঃ মায়েদা ঃ আয়াত - ৫৪)

বল, হে কুরআন! পূর্ববর্তী নবীগণও কি জিহাদ করেছেন?

হ্যাঁ-

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

'দাউদ জালুতকে (রণাঙ্গনে) হত্যা করেছিল।'

নবীগণের জিহাদ করার কথা শুনলাম, এবার বল, পূর্ববর্তী নবীগণের অলী-অনুসারীগণের উপরও কি জিহাদ ফরয ছিল?

অবশ্যই-

وَكَاَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيْرٌ

'আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে।' (আলে ইমরান ঃ আয়াত - ১৪৬)

কুরআনের কথা অবশ্যই সত্য। তবে সমস্যা হল, আমরা জিহাদে যেতে চাচ্ছি কিন্তু আব্বা জিহাদে যেতে বারণ করেন, আম্মা বাধা দেন, স্ত্রী না যেতে অনুরোধ করে, উপরন্তু তখন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ও ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়ে-এসব ফেলে রেখে কিভাবে জিহাদে যাব?

হুবহু এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَائُكُمْ وَاَبْنَائُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرُسولِهِ وَجِهادٍ فى سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ (سورة التوبة - ٢٤)

'তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা - যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর। তা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা পর্যন্ত।'

এভাবে জিহাদ সম্বন্ধে কুরআনকে যে কোন প্রশ্ন করা হলে নিঃসন্দেহে তার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে।

পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ সূরা আনফাল জিহাদ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সূরা তাওবা নাযিল হয়েছে জিহাদ উপলক্ষ্যে। সূরা মুহাম্মদেও আলোচিত হয়েছে জিহাদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে। সূরা ফাতাহ ও নসর নাযিল হয়েছে জিহাদ উপলক্ষ্যে। সূরা হজ্জ্ব ও মুমতাহিনায়ও জিহাদের বিধানাবলী সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। সূরা হাদীদ-এ লোহা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কেন লোহা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া মদীনায় অবতীর্ণ প্রতিটি সূরায় জিহাদ সম্পর্কে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। কুরআনের প্রতিটি পারায় আপনি পাবেন জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, জিহাদ ইসলামের কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যে কুরআন পড়েছে, বুঝেছে, সে কখনও জিহাদ ত্যাগ করতে পারে না, জিহাদ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হতে পারে না। তবে যে কুরআন ত্যাগ করেছে এবং কুরআনের দাবী প্রত্যাখ্যান করে দুর্ভাগ্যের তিলক কপালে এঁটেছে, সে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কি বুঝবে?

জিহাদের মূল কথা

প্রথমে বুঝতে হবে, আল্লাহ যে ইবাদতকে যে নামে অভিহিত করেছেন, তাকে সে নামে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়।

নামাযকে আরবীতে 'সালাত' বলা হয়। এই নামাযকে সালাত ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা কি ঠিক হবে?

যদি কোন পন্ডিত বলে, আমি অভিধানে দেখেছি, শরীরের নিম্নাংশ হেলানকে নামায বলে এবং সে অনুযায়ী যদি কেউ সকালে ওঠে দুই-তিন বার নিতম্ব হেলায়, তবে একে কেউ নামায বলবে?

কেউ যদি বলে, 'সালাত' অর্থ রহমত বর্ষণ। অতএব এ অর্থ অনুযায়ী কেউ যদি সকালে ওঠে নামায আদায়ের নিয়তে আল্লাহর নিকট দু'চার বার রহমাতের দোয়া করে, তবে এ দোয়াকে কেউ কি নামায বলবে?

আমরা অস্বীকার করি না যে, নিতম্ব হেলান বা রহমত বর্ষণ অর্থেও 'সালাত' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আল্লাহ যখন ব্যাখ্যাসহ বলে দিয়েছেন যে, নামায সেই ইবাদতকে বলে, যা অযুসহ কেবলামুখি হয়ে ইমামের পেছনে কেরাত-কেয়াম-রুকু-সেজদাহ ও বসার সাথে আদায় করতে হবে। আল্লাহর এ ব্যাখ্যা ব্যতীত নামায সম্পর্কে অন্য কারও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে কি? এই ব্যাখ্যা ব্যতীত সালাতের দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যা ভুল ও মিথ্যা নয় কি?

তবে একটি ভ্রান্ত দলের লোকদের মুখে শোনা যাচ্ছে, তারা বলছে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى

'তোমরা এ জন্য নামায পড়, যাতে আমাকে স্মরণ করতে পার।'

অতএব নামাযের কি দরকার। ইমামেরও বা কি প্রয়োজন। মসজিদদেরই বা দরকার কি। এতো ঝামেলা না করে কোথাও বসে কিছুক্ষণ আল্লাহর যিক্‌র করলেই তো হল।

এদের এই বিশ্বাস ও বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ মুফতীগণ এদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা নামাযের যে অর্থ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তা গ্রহণ না করে এরা অন্য অর্থ গ্রহণ করেছে, যা ভুল। তাই মুসলিম বলয় থেকে ওরা বহিস্কৃত।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট একটা ইবাদাতকে রোযা বা সিয়াম বলেছেন এবং সেই ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইবাদাতটিকেই কেবল সিয়াম বলা হবে। এর ব্যত্যয় হলে তাকে সিয়াম বলা যাবে না।

কেউ যদি বলে, আমি অভিধানে দেখেছি, সিয়াম অর্থ বিরত থাকা। অতএব সে যদি দিনের বেলা মাত্র দু'-এক ঘন্টা খানাপিনা ও সহবাস থেকে বিরত থাকে, তবে একে কেউ রোযা বলবে?

অথচ ইসলামে রোযার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সোব্হে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন ও হাদীসে রোযার যত ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, তা সে-ই পাবে, যে ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী রোযা রাখবে।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এভাবে আল্লাহ তায়ালা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলে এক বিশেষ ইবাদাতকে অবিহিত করেছেন। যে ইবাদত পালনে তরবারী, ঘোড়া, বন্দুক ও গোলাবারুদের প্রয়োজন হয় এবং ইসলামবিরোধী কাফির শক্তির সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের অবতারণা হয়। এ যুদ্ধের পর যদি মুসলিম বাহিনীর কোন সদস্য জীবিত থাকে, তবে তাকে গাজী বলা হয়, আর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে তাকে শহীদ বলা হয়। এই নিয়মে যারা জিহাদ করবে, জিহাদের সকল ফযীলত তাদেরই ভাগ্যে জুটবে। এর ব্যতিক্রম নয়।

অতএব কেউ যদি বলে, আমি আরবী অভিধানে দেখেছি, জিহাদ অর্থ- কষ্টবরণ ও চেষ্টা করা। সে কষ্ট ও চেষ্টা যে ধরনের হোক, মহিলার বাচ্চা প্রতিপালনের কষ্ট হোক-তাও জিহাদ, ভাত পাকান ও কাপড় ধোয়া-তাও জিহাদ। জিহাদ সম্পর্কে তার এ ধারণা ভুল নয় কি?

কেননা মদীনায় সাহাবীদেরকে যখন বলা হত, এস জিহাদে চল, তখন তাঁরা তরবারী ও ঘোড়া নিয়ে আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভের দুর্নিবার আকাঙ্খায় কাফিরদের মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রিয়নবী (সঃ) জীবিত থাকাকালীন সময় পর্যন্ত জিহাদ সম্পর্কে এর ব্যতিক্রম কোন ধারণা কেউ পোষণ করত না।

ইসলামী আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ইমাম ও ফকীহদের কিতাব খুলে দেখুন, তারা জিহাদের অর্থ ও ব্যাখ্যায় কি লিখেছেন ঃ

তারা লিখেছেন,

بَذْلُ الْجُهْدِ فِى قِتَالِ الْكُفَّارِ

'নিজের সবটুকু শক্তি কাফিরের মোকাবেলায় যুদ্ধে ব্যয় করাকে জিহাদ বলে।' (ফাতহুল বারী, খ ঃ ৬, পৃ ঃ ২)

হাম্বলী, শাফী ও হানাফী মাযহাবের কিতাব খুলে দেখুন, যার সার কথা এই দাঁড়াবে,

بَذْلُ اَحسَنِ الجُهْدِ فى قِتال الكُفار

'সর্বাত্মকভাবে সকল শক্তি কাফিরের মুকাবেলায় যুদ্ধে ব্যয় করা, মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতা করা। একেই জিহাদ বলে এবং একেই কিতাল বলে।'

এছাড়া জিহাদের অন্য কোন অর্থ, ব্যাখ্যা ও ধারণা স্বীকৃত নয়।

শুনে বিস্মিত হতে হয়, আর্থিক আয়-উপার্জন করাকেও জিহাদ বলা হচ্ছে, সত্য কথা বলাকেও জিহাদ বলা হচ্ছে।

কথা মিথ্যা নয়, হয়ত তারা এসবকে এ জন্য জিহাদ বলছে, যেহেতু সাধারণত যে যা বেশী ভালবাসে এবং যা সে করে তা থেকে আরও বেশী উপকৃত হওয়ার ইচ্ছায় ভাল বিষয়ের সাথে তার কাজকে তুলনা করে। এটা মানুষের অভ্যাস।

আমাদের সমাজে পুত্রের নিকট পিতার অপরিসীম সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। দারুণ শ্রদ্ধা সমীহ বিরাজিত থাকে পিতার সাথে পুত্রের লেনদেন ও আচরণের মাঝে। পিতার প্রতি সামান্য অশ্রদ্ধা ও অবহেলাকে গণ্য করা হয় বড় পাপ ও জঘন্য অপরাধ হিসেবে। পুত্রের প্রতি পিতা খুশী তো আল্লাহ তার প্রতি খুশী। পিতা অসন্তুষ্ট তো আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।

এবার মনে করুন,ঃ কোন লোক তার পিতার দারুণ অনুগত ও অনুরক্ত। বলা মাত্র তার আদেশ পালন করে থাকে। পিতার সামনে টু শব্দটি করে না। সবার উপরে পিতার কথা প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বৃদ্ধ পিতার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সে। এই পুত্রের নিকট এমন এক লোককে উপস্থিত করা হল, যে তার বাপের মত অতিবৃদ্ধ, কিন্তু অসহায়। ভীষণ শীতে বৃদ্ধ লোকটি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। এখানে তার আপন কেউ নেই। মাথা গুজার ঠাঁইটুকু নেই। এমতাবস্থায় তাকে বলা হল, এই গরীব, অসহায় বৃদ্ধ লোকটিকে পিতা মনে করে আপাততঃ তোমার কাছে রাখ। তার শোয়া, থাকা ও খাবারের সামান্য ব্যবস্থা কর।

উল্লেখ্য, এখানে ঐ লোকটিকে ছেলেটির নিকট এনে কেন 'বাপের

মত' বলা হল? আসলে ত সে তার বাপ নয়-তারা পরস্পরে পিতা-পুত্রও নয়। তবুও তাকে বাপের মত করে সেবা করার অনুরোধ করা হল। কারণ ছেলেটি তার বাপের একান্ত অনুগত ও খেদমতগার। এখানে বাপের প্রতি তার শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও আনুগত্যের সুযোগ গ্রহণ করে এই লোকটির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু পিতার প্রতি সে ভীষণ দুর্বল, তাই পিতার কথা উল্লেখ করায় ছেলেটি সহজে রাজী হয়ে যাবে এবং এখানে বৃদ্ধলোকটি যথার্থ খেদমত পাবে। যাকে বলে অনুভূতির দোহাই, কেউ একে অনুভূতির চৌর্যবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। মূল জিহাদকে অন্যসব কাজের সাথে তুলনা করার কারণও এটাই।

জিহাদ ও মর্যাদার বিন্যাস

ইসলামী সমাজ, চেতনা ও জীবন-মূল্যবোধে জিহাদই ছিল মর্যাদা বিন্যাসের অন্যতম মাদন্ড। জিহাদে সাহাবীদের অসামান্য কুরবানীর কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তাদের এত মর্যাদা ও গুরুত্ব, এ কারণেই তাঁরা উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁরা বদরী, এঁরা অহুদী, এঁরা হুনাইনী-এই হলেন সালমা বিন আকওয়া যিনি পদাতিক বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন। এই হলেন কাতাদা (রাঃ) যার সাথে ঘোড়দৌড়ে কেউ পারত না। জিহাদের ময়দানে তার তেজস্বী ঘোড়ার কৌশলী আক্রমণ বিরোধী পক্ষকে সন্ত্রস্ত করে তুলত।

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, প্রিয়নবী (সঃ) অন্য কোন সাহাবীকে কখনও একথা বলেননি, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক, একমাত্র স'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ব্যতীত। তিনি জিহাদের ময়দানে বলেছিলেন, 'হে সা'আদ! কাফিরের গায়ে তীর নিক্ষেপ কর, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।' এই জিহাদই হযরত হানজালা (রাঃ)কে (শাহাদাতের পর ফেরেশতাগণ যাকে গোসল করিয়েছিলেন, কেননা শাহাদাতের সময় তার শরীর অপবিত্র ছিল) 'গাসীলুল মালায়িকা' উপাধিতে ভূষিত করেছে। এই জিহাদই হযরত হামজা (রাঃ) কে 'সাইয়েদুশ শুহাদা' অভিধায় ভূষিত করেছে। এই জিহাদই সাহাবীদেরকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করিয়েছে। যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তুলনাহীন।

মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর নিকট জিহাদ এতই গুরুত্ব, মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রিয় বিষয় ছিল যে, স্ত্রী তার স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে বলত, বিছানায় শুয়ে মর না, জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়।

মদীনায় জিহাদের ডংকা বেজেছে। সাজ সাজ রব পড়েছে। এমন সময় কোন এক মহিলার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাহাবীগণ কাছে যেয়ে দেখেন, এক বৃদ্ধা কাঁদছে। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, কেন কাঁদছ তুমি? মহিলা বল্‌ল, প্রতিটি ঘর থেকে আজ কেউ না কেউ জিহাদে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোন যুবক ছেলে নেই যাকে জিহাদে পাঠাব। বৃদ্ধ স্বামীটিও নেই যে অন্তত তাকে জিহাদে পাঠাব। আমার কেউ নেই কাকে আমি জিহাদে পাঠাব। জিহাদের সওয়াব থেকে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ দুঃখে আমি কাঁদছি। আমার মাথার কিছু চুল কেটে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রিয় নবী (সঃ)কে এ চুলগুচ্ছ দিও। তিনি যেন আমার চুল গুচ্ছকে ঘোড়ার লাগামের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেন। যেন আমি অসহায় বৃদ্ধা এই জিহাদের অংশ থেকে বঞ্চিত না হই।

মদীনার সকলে রণসাজে সজ্জিত হয়েছে। এবার জিহাদে যাত্রা করার পালা। এমন সময় এক কিশোর এসে প্রিয়নবী (সঃ) কে বল্‌ল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জিহাদে নিয়ে চলুন। প্রিয়নবী (সঃ) দেখলেন, ছেলেটি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান। তিনি বল্‌লেন, হ্যাঁ, তুমি যেতে পারবে। তারই পাশে দাঁড়ান আরেকটি ছেলে চোখের পানি ছেড়ে অনুনয় করে বল্‌ল, ‘ওকে নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে কেন রেখে যাচ্ছেন, হে আল্লার নবী! বললেন, আরে ও-ত বেশ বড় হয়েছে, শরীরে শক্তি আছে, (তুমি তো এখনও বেশ ছোট)। ছেলেটি বলল, আমি দুর্বল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমাদের পরস্পরে কুস্তি লড়াই হোক।

এবার শাহাদাত লাভের অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে কিশোরটি কুস্তি লড়বে। উভয়ে প্রস্তুতি নিয়ে কাছে এসেছে। এই ফাঁকে ছোট ছেলেটি বড়টির কানে কানে বলে, ভাইয়া! তুমি তো অনুমতি পেয়ে গেছ। এ কুস্তিতে পরাজিত হলেও তুমি জিহাদে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছ। এবার আমার প্রতি রহম কর। কুস্তি শুরু হলে তুমি পরাজিত হওয়ার ভঙ্গিমায় শুয়ে পড়বে। আমি তোমার বুকে চড়ে নাটকীয়রূপে বিজয়ী হয়ে যাব। ফলে আমি জিহাদে যাওয়ার সুযোগ পাব। কুস্তি শুরু হল। বড় ছিলেটি নীচে পড়ে গেল। ছোট ছেলেটি তার বুকে বসল। সে বিজয়ী হল। উভয়ে জিহাদে যাওয়ার সুযোগ পেল।

এবার সে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কাফেরের সাথে যুদ্ধ করছে। এক পর্যায়ে তার একটি হাত বাহু থেকে কেটে যায়। একটি রগসহ হাতটি ঝুলছে। হাতটি পা দিয়ে চেপে ধরে ছিড়ে ফেলে। এ ঝুলন্ত হাতটি যুদ্ধ

লড়তে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ঝটকা টানে ছিড়ে ছুড়ে ফেলে দিল কর্তিত হাতটি। আবার অদম্য সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাফিরের মোকাবেলায়।

অথচ আমাদের ছেলেদের পায়ে সামান্য একটি কাঁটা ফুটলেও চেচিয়ে মহল্লা মাথায় তুলে নেয়। আমাদের ছেলেরা খরগোশোর বাচ্চার মত প্রতিপালিত হচ্ছে। এরা খরগোশ ও ইঁদুরের চেয়েও ভয়াতুর। এই ভয়কাতর সন্তানদের দিয়ে কি হবে আমাদের ভবিষ্যতে। অপরের গোলামী ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ আছে? অথচ আমাদের সন্তানদের গড়ে তোলা উচিত ছিল মা'আজ ও মু'আওয়াজের আদর্শে।

তবুক জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী (সঃ) যখন অর্থকড়ি সংগ্রহ করার ঘোষণা করেন, তখন ওমর ফারুক (রাঃ) ভাবেন, এবার তিনি সিদ্দীকে আকবরের উপরে থাকবেন। তাঁর ঘরে প্রচুর মালামাল আছে। তিনি তাঁর ঘরে জমায়িত মালামালের অর্ধেক নিয়ে আসলেন। এদিকে সিদ্দিকে আকবর নিয়ে আসলেন তার ঘরের সবকিছু।

অল্পসংখ্যক সাহাবী বিশাল রোম ও পারস্য শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন। সামান্যসংখ্যক সাহাবী বড় বড় কেল্লা বিজয় করেছেন। ইসলামের ইতিহাস এ ধরনের ঘটনায় ভরপুর। অপরদিকে, একই যুদ্ধে দশ হাজার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তবুও কি তারা দমে ছিলেন? পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন? আদৌ নয়। তাদের অগ্রাভিযান চলেছিল অব্যাহত গতিতে। পৃথিবীর অর্ধেকটা ছিল তাদেরই দখলে।

মধ্য এশিয়ার সুদূর সমরকন্দ পর্যন্ত সাহাবীগণ পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের কবর জিয়ারত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারা ইসলামের পতাকা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন জানা পৃথিবীর সকল প্রান্তে। তাদের নিকট জিহাদ ছিল সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহর পথে জীবন দিতে তারা সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। জিহাদ তাদের এতই প্রিয় ছিল যে, পাপের কাফফারার জন্য তাঁরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৃত্যুবরণ তাদের নিকট ছিল অতি তুচ্ছ। তাই সেকালে ইসলাম সকল বাতিল শক্তির উপর ছিল বিজয়ী।

ইয়াহুদীরা দাবী করে বলেছিল, আমরা আল্লাহর সন্তান। আমরাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল ঃ

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

'যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে মৃত্যু কামনা কর'।

মৃত্যু অতিদ্রুত তোমাদেরকে মিলিত করবে তোমাদের প্রেমাস্পদ আল্লার সাথে। প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমাস্পদের মিলন কামনা করে। তোমাদের প্রেমাস্পদ আল্লাহর সাথে তোমাদের মিলনে একমাত্র বাধা মৃত্যু। অতএব মৃত্যুর ময়দানে এস।

কিন্তু

فَلَنْ يَّتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا

'কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না।'

মৃত্যুর ঘনঘটা শুরু হলে তারা সেখান থেকে দূরে পালায় এবং বলে, যেখানে মরণ আছে সেখানে আমরা নেই।

হে আমার প্রিয় মুসলিম ভায়েরা! তোমরাও খোদার সাথে ভালবাসার দাবী কর, তার সন্তুষ্টি কামনা কর অথচ মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াও। শাহাদাত বরণে অনীহা দেখাও। অতএব,কি পার্থক্য রইল ইয়াহুদী ও তোমাদের মাঝে?

জিহাদ কাকে বলে?

জিহাদ দ্বারা আগে যা বুঝাত সেই অর্থ সেই বোধগম্যতা আজও অপরিবর্তনীয়। আমি জানি, কুরআন ও হাদীসে জিহাদ কেবল যুদ্ধ বা কেতাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি। অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সালাত শব্দ নামায অর্থ ছাড়া অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِى

'আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণও তার জন্য রহমাতের দোয়া করেন।'

এ ক্ষেত্রে 'সালাত' নামায বাদে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ অর্থে সালাত দ্বারা কেবল এক বিশেষ ইবাদাত নামাযকেই বুঝায়। এভাবে জিহাদ দ্বারাও এক বিশেষ ইবাদাতকে বুঝান হয়েছে, যাতে তরবারী পরিচালিত হয়, তীরের প্রয়োজন হয়, গোলা-বারুদের দরকার হয়, যাতে শাহাদাত লাভ হয়। যাতে রয়েছে অগাধ সম্মান, যার মাধ্যমে বিজয় সূচিত হয়।

জিহাদের এ অর্থ অপরিবর্তনীয়। শত কোটি কাদিয়ানী ও ভন্ড মিলেও এ অর্থ বিকৃত করতে পারবে না।

একটা সময় ছিল যখন কোন মুসলমান জিহাদের আহ্বান জানালে সব মুসলমান অকুণ্ঠচিত্তে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বাতিলের পরাজয় ছিল সুনিশ্চিত। এভাবে বাতিল কাফিরচক্র তাদের ধারাবাহিক পরাজয়ে সংকিত হয়ে ঘৃণ্য কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা মোনাফিকদের মাধ্যমে মুসলিম মানসে জিহাদের বিকৃত অর্থ পুশ ও প্রচার করতে থাকে। তারা জিহাদের অর্থ-বিকৃতির ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এ কারণে জিহাদের শত শত অর্থ আজ মানুষের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। ইয়াহুদী-খৃস্ট চক্রের সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের দলিল আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে, যা শুনলে আপনাদের গা শিউরে উঠবে। সে এক অন্য প্রসঙ্গ। আপাতত সে প্রসঙ্গ না বলাই রইল।

দ্বীন সুরক্ষার কেল্লা ঃ জিহাদ

জিহাদ ছিল আমাদের দ্বীন সুরক্ষার কেল্লা; দ্বীন সংরক্ষণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল এই জিহাদ। সমগ্র পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের অমুসলিম দেশের মুসলমানও নির্ভয়ে নামায আদায় করত। কেউ তাকে বাধা দেয়ার সাহস পেত না। তারা উচ্চকণ্ঠে আযান দিত, কেউ থামিয়ে দেয়ার দুঃসাহস দেখাত না। মুবাল্লিগরা দুনিয়াব্যাপী নির্বিবাদে দ্বীনের দাওয়াত দিত, কেউ তাদের রুখে দাঁড়ানোর হিম্মত করত না। আসলে তখন দ্বীনের কাজে কেউ বাঁধা দিলে তার বেঁচে থাকারই অধিকার ছিল না- সে যে ভুখন্ডের বাসিন্দা হোক। সেদিন আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অপরের সংস্কৃতির অপমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করা ছিল এক অমার্জনীয় অপরাধ। কঠিন শাস্তির কথা চিন্তা করে কুচক্রি মহল কোন ধরনের অপ-কর্ম সংগঠনের সাহসই পেত না।

আজ কুফরী শক্তি জিহাদের দেয়াল ভেঙ্গে আমাদের অমলীন সভ্যতা-সংস্কৃতির অবয়ব বিকৃত করে ছেড়েছে। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু দেশ ও সমাজ থেকে আজ বিলুপ্তির পথে। আমাদের সুসমৃদ্ধ অর্থব্যবস্থা পঙ্গু করে আমাদেরকে ওদের দয়ার মুখাপেক্ষি করে রেখেছে। ইসলামের আবশ্যকীয় ইবাদত-বন্দেগীকে ব্যক্তিগত রুচি ও অসহায়ের প্রার্থনা বলে মানুষকে বুঝাচ্ছে। আমাদের দ্বীনি শিক্ষার ভিত্তিমূলে আঘাত করে আলিম সমাজকে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক পরিচয়ে চরমভাবে অপমানিত করেছে। এই ডাকাতের দল হামলা করেছে ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রে, দ্বীনের সকল কেল্লায়।

যখন কারও সংরক্ষক থাকবে না, পাহারাদার থাকবে না, কোন অভিভাবক থাকবে না, তখন তাকে নিয়ে যার যা ইচ্ছা করতে থাকবে। অভিভাবকহীন মুসলিম জাতি আজ 'মালে মুফত' হিসেবে বিশ্ব বাজারে বেচাকেনা হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত হলেও যা ঘটার তাই ঘটেছে। কিন্তু যতদিন ইসলামের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল, ততদিন কোন কিশোরীর মাথা থেকে ওড়না ফেলে দেয়ার সাহস কারও ছিল? পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের কোন মুসলিম মহিলার ইজ্জাতের হানি হলে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেত জানবাজ সেনানির দল। কোন অমুসলিম সাহস পেত মুসলমানের সামনে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলার?

এ উপমহাদেশ দখল করে নেয়ার পর ইংরেজ দেখল, আলিম সমাজ তাদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে কার্যকরী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে-তারা জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখতে দেখতে ইংরেজের সাথে শামেলীর ময়দানে সচেতন আলিম সমাজের যুদ্ধ শুরু হল। এই জিহাদে যোগদানের জন্য উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষ হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কীও কঠিন শপথে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্য বৃটিশের শাসন মেনে নেননি।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রাহঃ) ও শাহ ইসলমাইল শহীদ (রাহঃ) এর দুর্নিবার জিহাদী তৎপরতা গভীর ভাবনায় নিক্ষেপ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিকে। এ ইতিহাস কে না জানে? এই সেদিনও মুসলিম ঘরানার প্রতিটি সন্তান জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখত। জিহাদ ও শাহাদাতই মুসলিম জীবনের একমাত্র কাম্য, এর প্রতি ছিলো তাদের নিখাঁদ বিশ্বাস। তাই বৃটিশ অপশক্তি অতি কৌশলে মুসলমানের এই ইস্পাতকঠিন বিশ্বাসে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টায় রত হয়। ইংরেজ ভাবল, যতদিন এ চেতনা মুসলিম জীবন ও মানসে অবিকৃত থাকবে ততদিন নিরাপদে এদেশ শাসন করা কঠিন হবে। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তারা অনুচর হিসেবে ধুর্ত মির্জা কাদিয়ানীকে বেছে নেয়। এবার ইংরেজের প্রত্যক্ষ মদদে উপমহাদেশব্যাপী শুরু হয় কাদিয়ানী তৎপরতা।

এই মির্জা কাদিয়ানী তার কিতাবে লিখেছে ঃ 'আমি বৃটিশ সরকারের স্বপক্ষে ও তাদের খুশী করার উদ্দেশ্যে এত কিতাব লিখেছি যে, পঞ্চাশটি আলমারী ভ়রে যাবে।'

এই ঈমানহারা দুর্ভাগাই মুসলিম মন ও মানসে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছে। যখন

শায়খুল হিন্দু মাহমুদুল হাসান (রাহঃ) ইংরেজ তাড়িয়ে সর্বভারতব্যাপী ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন সকল আ-লেম-ওলামাকে সাথে নিয়ে। যখন আম-জনতার মাঝে ইংরেজ খেদাও আন্দোলন সম্পর্কে কেবল সচেতনতা শুরু হয়েছিল, তখন এই বিশ্ব দালাল হাজার হাজার লিফলেট বিতরণ করেছিল এই উপমহাদেশের সকল এলাকায়। সে তাতে লিখেছিল ঃ 'হে মুসলিম সমাজ! তোমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। কেননা তোমরা শক্তি ও সামর্থহীন। আর শক্তি ছাড়া জিহাদ হয় না। উপরন্তু তোমাদের কোন আমিরও নেই। আমির ব্যতীত কখনও জিহাদ করা যায় না।'

এই দুর্ভাগা কাদিয়ানী ও তার সহচররা এই সব ভুল ধারণা এত নিখুঁতভাবে সাধারণ জনতার বিশ্বাস ও চিন্তায় পুশ করেছে এবং দক্ষ মুফতীর মত বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে যে, 'মুসলমানদের মাঝে একাধিক দল দেখা দিলে জিহাদের প্রয়োগ ও কার্যকারীতা মুলতবী থাকে, যতদিন না তারা ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে একমত না হবে।'

এ কথার কোন ভিত্তি আছে? এরূপ শত ভুল ধারণা ও সংশয় কাদিয়ানী চক্র মুসলিম মানস-চেতনায় সৃষ্টি করেছে। এর বিষক্রিয়ার ফলে একদল লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে, তারা বলছে, জিহাদ ফেরেশ্তাদের কাজ। মানুষের দ্বারা এ কাজ অসম্ভব। যতদিন আমরা ফেরেশতার পর্যায়ে না পৌছব, ততদিন জিহাদ করা যাবে না।

এরা ফেরেশতার পর্যায়ে পৌছতে বয়স শেষ করে মরে যাচ্ছে, কিন্তু জিহাদে অবতরণের সুদিন এদের জীবনে আসছে না। জানি না কবে এদের ঈমান পাকা হবে এবং জিহাদে অবতরণের যোগ্যতা লাভ করবে। অথচ ঈমানের বলিষ্ঠতা ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় জিহাদেরই মাধ্যমে। এই সত্য উপলব্দির সৌভাগ্য তাদের হবে কি?

প্রিয় বন্ধুরা! সাঁতার শিখতে হলে পুকুরে নামতে হয়। তীরে দাঁড়িয়ে ও শুয়ে সাঁতারের শত মহড়া দেখালেও জীবনেও সাঁতার শেখা যাবে না। দাওয়াত ও ওয়াজের মাহফিলে পঞ্চাশ বছরও যদি ঈমান পাকা করার কলা-কৌশল মুখস্ত করান হয়, তাতে আদৌ ঈমান পাকা হবে না। প্রতিপক্ষের একটি বুলেটের শব্দ শুনলে এরা বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে, এদের রুখে দাঁড়ানোর হিম্মত হবে না। জীবনভর এভাবে ঈমানের তালিম নিলে কাজ হবে না-যে ঈমান অর্জিত হবে মাত্র দশদিন জিহাদের ময়দানে

ব্যয় করার দ্বারা।

ইসলামের প্রতিপক্ষের গোলার আঘাতে আমাদের বন্ধুদের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে বৃক্ষের ডালে ঝুলে থাকে, বোমার আঘাতে দগ্ধ ও বিকৃত হয়ে যায় তাদের অবয়ব। মাইনের আঘাতে পা উড়ে নিক্ষিপ্ত হয় দূরে কোথাও। বিচ্ছিন্ন মাথা পাওয়া যায় না বহু খুঁজেও। আঘাতে আঘাতে কারও অবস্থা এমন হয় যে, চেনা যায় না, কে এই লোকটি? আমরা সেই প্রিয় বন্ধুদের শরীরের বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো জমা করি। তাদেরকে হাতে-কাঁধে তুলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেই। আমাদের মনে আদৌ ভয়ের উদয় হয় না, দুর্বলতাও খুঁজে পাই না। আসলে জিহাদ ঈমানকে বিশেষ এক শক্তি ও বলিষ্ঠতা দান করে, ঈমানকে পাকা করে। জিহাদের ময়দানে আহত মুজাহিদ একথা ভাবে না যে, আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত না অক্ষত। বরং সে ভাবে, দ্বীন নিরাপদ না কি সংকটাপন্ন। জিহাদের ময়দানে প্রতিটি মুজাহিদ আপন জীবন ও শরীর কুরবানী দিয়ে উম্মতের চিন্তার শুদ্ধতা, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকে। প্রতিটি মুমিনের কাছে আল্লাহ এটাই কামনা করেন।

জিহাদের ময়দানে হযরত হামজা (রাঃ)-এর শরীরকে বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। কাফিররা তার নাক, কান কেটে ফেলেছিল। দ্বীনের জন্য আমরা নাক, কান কাটাতে রাজী হব কি? যদি আমরা এতটুকু কুরবানী দিতে পারি, তবেই আসবে 'ফাতহুম মুবীন'-ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়। এ অঙ্গীকার অন্য কারও নয়, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর।

নামাযে আত্মমগ্নতা

অনেকে প্রশ্ন করে, মুজাহিদরা দাড়ি রাখে কি? কিভাবে তারা নামায পড়ে?

আবার অনেকে পান্ডিত্ব জাহির করে বলে, জিহাদ করার জন্য নামায আদায় ও দাড়ি রাখা অন্যতম শর্ত। যারা এসব পালন করে না, তাদের জন্য জিহাদ করা জায়িয নয়।

অথচ নামায ও জিহাদ আলাদা দু'টি ফরয কাজ। একটির সাথে অপরটি কোনভাবে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত নয়। অনুরূপ দাড়ি রাখাও একটি একক ওয়াজিব বিধান, অর্থাৎ দাড়ি রাখা, নামায আদায় ও জিহাদ করা সকলের উপর সমানভাবে অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। এর একটিও উপেক্ষা করার বিষয় নয়। অতএব তারা কিভাবে চিন্তা করে যে, মুজাহিদ

এসব ব্যাপারে অবহেলা করে? তারা যদি এসে দেখত, মুজাহিদরা কত একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করে, তবে অভিভূত হয়ে বলত, মানুষ কিভাবে নামাযে এত আত্মমগ্ন হতে পারে!

তাই কবি যথার্থ বলেছেন ঃ

نماز عشق اداهوتی هے تلواروں کی سائے میں

'আত্মমগ্ন ও একাগ্রতার নামাজ আদায় হয় তরবারীর ছায়াতলে।'

বৃষ্টির মত গোলা বর্ষিত হচ্ছে আর মুজাহিদ নামাজে বলছে ঃ

الحمد لله رب العالمين

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।'

এ সময় আল্লাহর প্রশংসা করতে কত যে মজা ও স্বাদ অনুভূত হয়, তা জিহাদরত মুজাহিদ ছাড়া কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

অতপর সে বলছে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর, যে পথে পরিচালিত হয়েছে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণ।'

মৃত্যু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে নামায পড়ছে।

একমাত্র এই নামাযেই ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ রয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। কেননা পতঙ্গের মত উড়ে আসা যে কোন একটি বুলেট এখনই তার জীবনাবসান ঘটাতে পারে। হয়ত এই নামাযরত অবস্থায়ই সে মিলিত হবে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে।

যদি মুজাহিদরা বে-নামাযী হত, তবে কি তাদের সাহায্যে আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরিত হত? এক রুশ জেনারেল বলেছিলেন ঃ 'মুজাহিদের সাহায্যে আকাশ থেকে ফেরেশতা আগমন করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

এক ফরাসী সাংবাদিক বলেছিলেন ঃ 'আমি আফগানিস্তানে জিহাদের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের ভেতর বহুদিন সে দেশে কাটিয়েছি। দেশে ফিরে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মুজাহিদদের আল্লাহকে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি।'

যদি মুজাহিদরা বে-আমল ও বে-নামাযী হত, তবে এত বড় বিজয় ও আল্লাহর ব্যাপক সাহায্য তারা কিভাবে পেল।

আসলে জিহাদ সর্বতোভাবে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটায়। কেননা জিহাদের ময়দানে শয়তানের গমনাগমন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ময়দানে ফেরেশ্‌তাদেরকে দেখে শয়তান দৌড়ে পালায়।

হাদীসে এসেছে, জিহাদরত মুজাহিদদের যে কোন দু'আ আল্লাহর দরবারে নবীদের দু'আর মত কবুল হয়ে থাকে। কেননা জিহাদরত মুজাহিদ রিপুর তাড়নায় প্রভাবিত হয়ে কোন কাজ করে না। আল্লাহর রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করে। এমতাবস্থায় তার মনে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চিন্তা কল্পনাতীত ব্যাপার।

জিহাদের ভিত্তি

অধিকাংশ শহীদের খুন থেকে খোশবু বিচ্ছুরিত হয়; বহুবার এই খোশবু গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। জিহাদে যোগদানে উৎসাহিত করার পরিবর্তে অনেকে জিহাদে না যাওয়ার যুক্তি ও উপকারিতার কথা বলে আমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করত। তারা বলত, তুমি শহীদ হয়ে গেলে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তামাদি হয়ে যাবে। কিন্তু যে লোক শহীদের খোশবুদার খুনের ঘ্রাণ শুঁকেছে, তার পক্ষে জিহাদ থেকে দূরে থাকা কি সম্ভব?

যারা আমাকে রণাঙ্গন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়, তাদের কথা গ্রহণ করা কি করে সম্ভব আমার পক্ষে? উপরন্তু জিহাদে যোগদান করার পর দু'টি বিষয় আমাকে দারুণভাবে আন্দোলিত করেছে ঃ

এক, ওহুদের ময়দানে প্রিয়নবীর (সাঃ) এর রক্তস্নাত হওয়ার বিষয়টি।

দুই, শহীদদের খুনের খোশবু।

আজ যদি কেউ জিহাদের উপকারিতার বিপরীতে হাজারও দলিল পেশ করে, তা গ্রহণ করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। যে কাজে প্রিয়নবী (সাঃ) আপন শরীরের রক্ত ঝরিয়েছেন, সে কাজ যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম তা এখন আমার কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় আমার হৃদয়ের কোথাও নেই।

আমাদের এ জিহাদী আন্দোলন কোন স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে গড়ে

উঠেনি। আমাদের এ আন্দোলনের গুরুত্ব কত অপরিসীম, তা অনুধাবন করা যাবে তা দেখলে, যা দিয়ে লিখিত হয়েছে ইসলামের সূচীপত্র, শিরোনাম, ভূমিকা ও পরিচিতি। আর তা হল প্রিয়নবীর (সাঃ) শরীর থেকে ঝরান লাল রক্ত। তাই বলছি, জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করা সম্ভব হত, তবে কেন আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে তাঁর আদুরে নবীর রক্ত ঝরাবেন? ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য প্রিয়নবী (সাঃ) রক্ত না ঝরিয়ে সহজ কোন পন্থাও ত গ্রহণ করতে পারতেন, যেভাবে আমরা দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বহু নিরাপদ কৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছি!

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও তার মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য প্রিয়নবী (সাঃ) রক্ত ঝরাবেন। তিনি জিহাদে মারাত্মক আহত হবেন। আর তার উম্মত গবেষণা করে আবিষ্কার করবে, আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে হবে জিহাদ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে। এ যে কত মারাত্মক ভ্রান্তি তা কাগজে লিখে বুঝান সম্ভব কি?

আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির শাহাদাত বরণে জিহাদের মিশন বন্ধ হয় না, বরং আরও বেগবান হয়।

আমি যখন আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণ করি, তখন আমাদের কমান্ডার ছিল আবদুর রশীদ (আল্লাহ তার কবরে সর্বক্ষণ রহমত নাযিল করুন)। সে শাহাদাত বরণ করলে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সকলের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দুঃখবোধের করুণ ছাপ। আমরা দেখলাম, তিনি হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তার সে হাসো হাসো মুখ এখনও আমার চোখের সামনে চাঁদের মত ভাসছে।

তখন সকলে আমাকে বল্‌ল, সামনের পরিখায় যেয়ে তুমি তাদের প্রিয় কমান্ডারের শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছিয়ে এস। তাদের যেয়ে বল, তোমাদের প্রিয়তম কমান্ডার শহীদ হয়ে গেছে।

সে অত্যন্ত দক্ষ কমান্ডার ছিল। বহুবার সে শত্রুদের গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরাপদে সামনে অগ্রসর হয়েছে। এভাবে বহু শত্রুক্যাম্প ও পরিখা সে দখল করেছে। শত্রুরা ভাবতেও পারেনি যে, মুজাহিদরা এত বিপদগ্রস্ত ও সঙ্গীন মুহূর্তে চিতার মত তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে নেবে। গোলাবৃষ্টির মাঝেও তাকে মনে হত যে, সে কোন নিরাপদ পথ দিয়ে সোজা হেঁটে কারও উপর চড়াও হচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তিরা

ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে, এ সময় কেউ তাদের উপর চরম আঘাত হানতে পারে।

একবার সে শুধু ক্লাসিনকভ হাতে নিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সতের জন রুশ সৈনিককে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল। শত্রু সেনাদেরকে লক্ষ্য করে সে শুধু উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। সেই তাকবীর শুনে রুশ সেনাদের মনে ভীষণ কম্পন সৃষ্টি হয়। তারা থর থর কাঁপতে থাকে। ভয়ে কখন তাদের হাত থেকে অস্ত্রগুলো মাটিতে পড়ে গেছে, তা তারা ঠাহর করতে পারেনি।

এই মহান কমান্ডার ক্যাম্পে এসে সাথীদের জন্য চুলায় রুটি পাকাত, ভাত-তরকারি পাকাত। তার বহু স্মৃতি আমার হৃদয় পটে আজও জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

তার শাহাদাতের সংবাদ নিয়ে গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে সামনের পরিখায় অগ্রসর হলাম, সাথীদেরকে জমা করে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বুঝালাম, প্রিয়নবীও (সাঃ) দুনিয়া থেকে তিরোহিত হয়েছেন। সাহাবীগণ তার শেষ বিদায়ের যন্ত্রণা হজম করেছেন। আজ তোমাদের প্রিয়তম কমান্ডার আবদুর রশীদও দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তার এ বিদায় যন্ত্রণা আমাদেরও হজম করতে হবে।

সবাই এ সংবাদ শুনে হতবাক হয়েছিল। সকলের চেহারা মলিনতায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল। অবাক তাকিয়েছিল সকলে আমার মুখের দিকে। কারও মুখ থেকে একটি শব্দ বেরুচ্ছিল না।

কমান্ডার আবদুর রশীদ শাহাদাত বরণ করার পর ভেবেছিলাম, আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, শহীদ কখনও মরে না। আবদুর রশীদ শহীদ হয়েছে বটে কিন্তু আল্লাহ তার পরিবর্তে আমাদেরকে দান করলেন বহু আবদুর রশীদ। তারা যখন ময়দানে শত্রুর মুকাবিলায় দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আমার মনে হত, আবদুর রশীদ বুঝি দৌড়াচ্ছে। তার পরবর্তী কমান্ডার মৌলভী সাব্বির আহমদ বহুবার প্রিয়নবীকে (সা) স্বপ্নে দেখেছে। সে–ও শাহাদাতবরণ করল। আমরা ভাবলাম, আর বুঝি কাজ চলবে না। কিন্তু তার পরে আল্লাহ আমাদেরকে আরও বহু সুযোগ্য কমান্ডার দান করলেন।

শাহাদাত বরণের কল্যাণে জিহাদী তৎপরতা আরও বেগবান ও শক্তিশালী হয়। শহীদের শরীর সিঞ্চিত রক্তই বাড়ন্ত করে ইসলাম নামক

বৃক্ষটিকে। ইসলাম নামক জ্বলন্ত মশালটি জ্বালিয়ে রাখতে যে তেলের প্রয়োজন, তা-ও ঐ শহীদেরই খুন। এই তেলের ঘাটতি পড়লে মশালটি টিমটিম করে জ্বলতে থাকে। তাই আল্লাহ ইসলামের জীবনের জন্য চান শহীদের খুন। এ খুনের বদলায় তার দরবারে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত ও মহাপুরস্কার।

ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠায় ত্যাগবরণ

কমিউনিজমের পতন ও ইসলামী বিধানের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য পবিত্র মক্কা থেকে শায়েখ উসামা বিন লাদিন এখন ইসলামী আফগানিস্তানের পর্বতঘেরা দুর্ভেদ্য উপত্যকায় কর্মব্যস্ততার মাঝে দিন অতিবাহিত করছেন। পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানের জানবাজ কমান্ডার আবদুর রশীদ বিশ্বময় ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যেই শাহাদাত বরণ করে ধন্য হয়েছেন। বাংলাদেশের মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী ও মুফতী আবু ওবায়দার শাহাদাত ও সফল কুরবানী বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের আল্লাহর সৈনিকদের চির প্রেরণা ও মাইলফলক হয়ে থাকবে। একই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আলজেরিয়ায় তাগুতের সাথে মুজাহিদদের সংগ্রাম চলছে। মিসরের অকুতোভয় মুজাহিদ সৈনিকেরা বাতিলের সাথে প্রতিদিন লড়াই করে যাচ্ছে। বসনিয়ায় মুজাহিদদের বিজয় হয়েছে। চেচনিয়ায় ইসলামের বিজয় ঝান্ডা পত পত করে উড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে ঈমানে বলিষ্ঠ মুজাহিদ কাফেলা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের সজ্জিত বাতিল ও কুফরের সাথে সম্মুখ সমরে বিজয় ছিনিয়ে আনছে। রাশিয়া-আমেরিকা অবাক হয়ে ভাবছে, এত দক্ষ মুজাহিদ কোথা থেকে আসছে। তাগুদী শক্তি ময়দানে দশদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে। জমিনের মুজাহিদ ও আকাশের ফেরেশতারা তাদেরকে পেরেশান ও বিদিশা করে তুলছে। ওরা ভেবে পাচ্ছে না, কিভাবে ও কোথায় পাচ্ছে মুজাহিদরা এত সমরাস্ত্র ও সুদক্ষ সৈনিক।

আফগান রণাঙ্গনে তের বছর যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত নিঃশেষ হয়ে গেছে সম্পূর্ণরূপে। পৃথিবী থেকে কমিউনিজমের বিলুপ্তি ঘটেছে, ইসলামের সাথে টক্কর খেয়ে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে সোভিয়েত রাশিয়া। তার এখন লবেজান দশা। এখন আছে শুধু তার বেহুদা বাগাড়ম্বরতা। কার্লমার্ক্স ও লেনিন দর্শনের দাফন হয়ে গেছে। কমিউনিজমের শেষ নিশানা পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার পথে। ওদের বিধ্বস্ত প্রতিমূর্তির গায়ে এককালের লেনিন সতীর্থরা পেশাব করেছে, থুথু দিয়েছে।

অথচ ইসলাম তার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখে এখনও বিশ্বময় বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইসলামের একটি মোস্তাহাব বিষয়ও বিলুপ্ত হয়নি। শত চেষ্টা করেও এর বিলুপ্তি ঘটাতে পারেনি।

আমরা আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করি, আফগান জিহাদে ষোল লক্ষ লোক শাহাদাত বরণ করলেও কেউ কাঁদেনি। লক্ষ্য কোটি জীবনের বিনিময়ে হলেও আমাদের আদর্শ বেঁচে আছে আপন মহিমায় প্রতিটি মু-মিনের হৃদয়ে, গভীর আস্থার সাথে। কেন কাঁদব আমরা। আমরা কিছুই হারাইনি। বরং আমরা কৃতজ্ঞ। লক্ষ্য জীবন দিয়ে হলেও ইসলামের মহিমা ও মুসলিমের মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। তাই মহান আল্লাহর দরবারে জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া। প্রার্থনা জানাই, হে আল্লাহ! আমাদের এ কুরবানী তুমি কবুল কর। এর বিনিময়ে দাও উত্তম পুরস্কার।

তাগুদ-রুশ কাঁদছে এবং কাঁদবে। কেননা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের অপমৃত্যু ঘটেছে। শত কৌশল ও ঔষধ প্রয়োগ করেও কমিউনিজমকে তারা বাঁচাতে পারেনি। এ ব্যর্থতার জন্য তারা তো কাঁদবেই। সত্য কথা হল, অপ্রাকৃতিক মতবাদ কমিউনিজমের অপমৃত্যু ছিল অবধারিত। বহু দেরীতে হলেও এ সত্য কথাটি তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে বলে আনন্দবোধ করি। তবে এখনও যাদের বুঝে আসেনি তারা আজরাইলের অপেক্ষা করুন।

এরাই আল্লাহর জানাযা মিছিল করেছিল। কিন্তু অবিলম্বে তাদেরই শবযাত্রা পৃথিবীর মানুষ অবাক্ তাকিয়ে দেখল। এরাই জঘন্য স্পর্ধার সাথে দেয়ালে দেয়ালে রঙিন পোস্টার সেঁটেছিলো ঃ "আমরা আকাশের খোদাকে মর্তে নিয়ে আসব"। এরা আকাশের খোদাকে ধূলোর পৃথিবীতে অপসারিত করবে তো দূরের কথা সেই মহান খোদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বান্দাদের সাথেই এরা মোকাবেলায় ধরাশায়ী।

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা ব্যক্তিস্বার্থ ও মানবগড়া অপ্রাকৃতিক কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ করি না। আমরা খোদায়ী বিধান ও রাসূলের (রাঃ) আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করি। আমাদের প্রতিটি প্রাণ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উৎসর্গিত। তাই আমরা প্রতিটি যুদ্ধে লাভ করি আল্লাহর ব্যাপক সাহায্য।

একদিন ওমর ফারুক (রাঃ) মসজিদে নববীতে খুৎবা দিচ্ছেন। তখন তার এক কমান্ডার যুদ্ধ করছিলেন মদীনা থেকে সহস্র মাইল দূরে।

তার নাম হযরত সারিয়া (রাঃ)। প্রচন্ড লড়াই চলছে। এমন সময় তিনি শুনতে পান, কেউ তাকে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে বলছে ঃ

يا سارِيةَ الجبلَ

"সারিয়া ! পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ।"

এই আওয়াজ শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ পেছনে তাকান এবং দেখেন, শত্রু সৈন্য তাঁর উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। এর পূর্বে তিনি তা অনুমান করতে পারেননি। অতঃপর মুসলিম সৈনিকরা তৎক্ষণাৎ শত্রুর উপর হামলা করে তাদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে।

তিনি মদীনায় ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন ছিল যুদ্ধের অবস্থা? তিনি বল্লেন, আমরা আশংকাজনক অবস্থায় ছিলাম। হয়ত পরাজিত হতাম। প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। শত্রুবাহিনী কৌশলগতভাবে ভাল অবস্থানে ছিল। তারা যে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে তা কল্পনাও করিনি, তারা পেছন দিক থেকে আমাদের উপর হামলা করে বসবে........। এমন সময় শুনলাম, ওমর (রাঃ) এর কণ্ঠে কে যেন আমাকে ডেকে বলছে, "হে সারিয়া ! পাহাড়ের দিকে তাকাও"।

তার এ কথা শুনে সাহাবীগণ বল্লেন, আমরা তার খুৎবা শুনছিলাম। হঠাৎ তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চশব্দে বল্লেন, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তাকাও।" এভাবে আল্লাহপাক মুজাহিদদেরকে জিহাদের ময়দানে পথ-নির্দেশ ও সাহায্য করে থাকেন।

আল্লাহপাক বাতাসকে মুজাহিদদের অনুগত করে দেন। পানির উপর দিয়ে তারা ঘোড়া দৌড়িয়ে ওপার পৌছেছেন। পশু-পাখী তাদের সাহায্য করে থাকে। এর শত শত প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাসের এই জ্বলন্ত সত্যগুলো কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু তাগুতের কি সহ্য হয় ইসলামের বিজয়? তাই আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিজয় অর্জনে আমেরিকার মাথা ব্যথা শুরু হয়। তারা ভাবে, ওদেরকে তো আমরা যুদ্ধের-জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলাম, এই যুদ্ধে ওরা বিজয় লাভ করবে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। উপরন্তু ওদের পরাজয় ও পর্যুদস্ত হওয়া তো দূরের কথা বরং ওরা বিজয়ের নেশায় আগের চেয়ে বহুগুণে সতেজ ও শক্তিশালী হয়েছে। এখন আফগানিস্তানে যুদ্ধে অভিজ্ঞ দশ লাখ দক্ষ মুজাহিদ রয়েছে। পৃথিবীর তাবৎ সুপার শক্তিগুলোর যুদ্ধাভিজ্ঞ সমন্বিত সেনা সংখ্যা দশ লাখ হবে কি? না, পৃথিবীর সকল

দেশের সৈন্য মিলেও দশ লাখ যুদ্ধাভিজ্ঞ সৈনিক হবে না।

আমেরিকাসহ অন্যান্য সকল দেশের সৈনিকরা অস্ত্র চালনা ও নিশানাবাজি শিখে দেয়ালের গায়ে গুলী চালিয়ে। আর আফগান মুজাহিদরা বন্দুক হাতে নিয়ে প্রথম নিশানা পরীক্ষা করে দেখেছে রুশ সেনাদের মাথায় গুলী চালিয়ে। আমেরিকার সেনারা প্রশিক্ষণ নেয় নিরাপদ ময়দানে, স্কুল-একাডেমী ও সবুজ গালিচার চত্বরে। অত্যন্ত ধীরে সুস্থে তারা দেয়ালে নিশানা করে গুলী নিক্ষেপ করে। পক্ষান্তরে মুজাহিদরা গোলা বৃষ্টির মাঝে শত্রু টার্গেট করে হাত পাকা করে। তারা উত্তপ্ত মরু ও বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, জঙ্গল ও উপত্যকায় রাত-দিন শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তারা বিশ্রাম করে গুহায়, জঙ্গল বা বৃক্ষের নীচে। এই পোড়খাওয়া ও অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট মুজাহিদদের সাথে ঐ আয়েশী সেনাদের কোনো তুলনা হতে পারে? তাদের কাগুজে জেনারেলদের সাথে সাধারণ এক মুজাহিদকেও ওজন করা চলে?

আমেরিকা এই সত্য উপলব্ধি করে। সে চরম দুঃশ্চিন্তায় প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাচ্ছে। ভেবে কুল পাচ্ছে না, কিভাবে এই অজেয় শক্তিকে দমন করবে। তাই ওরা আল্লাহর লড়াকু সেনাদেরকে মৌলবাদী অভিধায় অভিষিক্ত করছে। নতুবা আমরা আগেও নামায পড়েছি এখনও পড়ি। তখন ত ওরা আমাদেরকে মৌলবাদী বলেনি। অতএব বুঝা যাচ্ছে, আ-মেরিকার ব্যাখ্যায়, আল্লাহর সৈনিক যারা তারাই মৌলবাদী।

ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় বেশী দূরে নয়

যে দায়িত্ব সম্পাদনে ইসলাম বিজয়ী হয়, সেই জিহাদ আজ শুরু হয়েছে দেশে দেশে, পৃথিবীর বহু উপত্যকা ও জনপদে জোরদার জিহাদী তৎপরতার কথা শোনা যাচ্ছে। ভারত-কাশ্মীরে জিহাদ শুরু হয়েছে, তাজিকিস্তানে জিহাদ শুরু হয়েছে। জিহাদ চলছে আলজেরিয়া, চেচনিয়া ও আরাকানসহ দুনিয়ার বহু মজলূম মানুষের ভূ-খন্ডে। আজ বিশ্বময় জিহাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। ঈমানদীপ্ত যুবা-তরুণ তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের মায়া ত্যাগ করে জিহাদে যোগদান করছে। স্ত্রী তার স্বামীকে মুজাহিদ সাজিয়ে ময়দানে পাঠাচ্ছে। জিহাদ ছাড়া যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মুক্তি নেই একথা আজ প্রায় সকলে গভীরভাবে উপলব্ধি করছে। ইসলামের পক্ষে জীবনবাজি রেখে বাতিলের মুকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়ে আল্লাহর মদদ লাভের সময় এসেছে।

সারা বিশ্বে পুলিশী ভূমিকায় অবতীর্ণ আমেরিকা এতদিন সবাইকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয় দেখিয়ে স্বার্থ হাসিলে মত্ত ছিল। কোন দেশে রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ দেখা দিলে গায়ে পড়ে পরামর্শ দিত, তোমাদের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন পরিচালনার আশংকা রয়েছে। অতএব সাবধান হও! এমনই এক জুজুর ভয় দেখিয়ে সে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে বলেছে, তোমরা আমাকে পেট্রোল দাও, আমিই ওদের মুকাবিলা করব। আমাকে এই সব মাল দিলে, সাহায্য করলে আমিই ওদের ঠেকিয়ে রাখব। এসব বলে প্রবঞ্চনা করে এতদিন সে মুসলিম বিশ্ব থেকে খয়রাত কুড়িয়েছে। মুসলিম দেশের সরকারগণ দেরীতে হলেও এখন আমেরিকার ভন্ডামি বুঝতে পেরেছে। দিন দিন পৃথিবী আমেরিকার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বিবেকবান মানুষ আমেরিকার প্রতি চরম বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে। আজ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আমেরিকার অযাচিত মাতুব্বরীর সমালোচনা করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে।

যদি কিছুদিন আগেও শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ জয়ে আমাদের ভীষণ ভীতি ছিল। এজন্য আমেরিকাকে সবাই কাছে পেতে চাইত এই আশায় যে, তাদের যুদ্ধটা আমেরিকা সেরে দেবে। মুসলিম নেতারা এখন এই ভুলের খেসারত দিয়ে যাচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে সৈন্য এনে রক্ষক এখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সময় আমাদেরকে যুদ্ধে নামিয়ে অভিজ্ঞতা দান করেছে। পৃথিবী এখন অবশ্যই স্বীকার করবে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ লড়ার দুঃসাহস দেখাবে কে?

আমাদের জীবন প্রিয়নবীর সাহাবীদের আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। যুদ্ধে দক্ষতা অর্জন করে সর্বক্ষণ বাতিলের মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। মুসলিম দেশের প্রত্যেক সরকার প্রধানকে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। ইসলাম বিলাসিতার শিক্ষা দেয় না, ইসলাম শিক্ষা দেয় ত্যাগ, বীরত্ব ও বিজয় অর্জনের।

হে যুবক ভায়েরা! এই আমার আহ্বান, এই আমার পয়গাম। বৃটিশ নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট লাভ করে বিলাসিতার শিকার হয়ো না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্য মুসলিমদের ন্যায় তোমাদেরও (বৃটেনে অবস্থানরত মুসলিমদের) সমান দায়িত্ব রয়েছে।

সাদা মানুষগুলো ইসলাম বিরোধিতা ও মুসলিম ঘৃণার জঘন্য মানসিকতা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। তাদের চেহারা দেখলে কুরআনের এই আয়াতটি মনে আসে ঃ

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ

'তাদের কথা দ্বারা ইসলাম-শক্রতা প্রকাশ পাচ্ছে।'

وَمَا تُخْفِى صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ

'এদের মনে যে ঘৃণা ও কালিমা রয়েছে, তা আরও জঘন্য।'

অতএব প্রস্তুতি গ্রহণ কর, জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়।

প্রিয়নবীর (সাঃ) ইনকেলাব

প্রিয়নবীর (সাঃ) দুনিয়া থেকে তিরোধানের পর এই দ্বীনকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছানো, দ্বীনে মুহাম্মদীকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বময় বিজয়ী করা, আল্লাহর বিধান কার্যকরীভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার নিরাপত্তা, শান্তি ও সুস্থিরতা নিশ্চিত করা, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করা, রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে প্রত্যেকের জীবনের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শরূপে বরণ করা এবং সাহাবীগণের প্রতি গভীর মমত্ব ও শ্রদ্ধা পোষণ করা সকল মুসলমানের আবশ্যিক নৈতিক দায়িত্ব।

প্রিয়নবী (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়ার কারণে তার তিরোধানের পর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতের আলিমদের উপর। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তারা এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে আসছেন। তাই বিশ্বময় প্রতিটি সাচ্চা মুমিনের হৃদয়ে আজও ইসলাম জীবন্ত, সচল ও পূর্ণমাত্রায় কার্যকর।

নবীদের উত্তরাধিকারী

প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। যে উত্তরাধিকার দায়িত্ব বন্টিত হবে দ্বীনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়ের উপর। এ দায়িত্ব পালনে কোন আলিমের সামান্য অবহেলার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলছি ঃ

কোন এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বহু লোক তাকে ঘিরে বসে আছে। কেউ কাছে বসে তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিচ্ছে, কেউ কলেমা পড়াচ্ছে। এমন সময় তার রূহ দেহ ত্যাগ করে। সে এখন মৃত। এমতাবস্থায় অপর এক ব্যক্তি তার সিয়রে প্রজ্বলিত বাতিটি নিভিয়ে দেয়। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, বাতিটির খুবই দরকার ছিল, একে গোসল করাতে হবে, কাফন পরাতে হবে, দাফন করতে হবে, কেন তুমি বাতিটি নিভিয়ে দিলে? লোকটি বল্‌ল, এ লোকটি যতক্ষণ জীবিত ছিল ততক্ষণ

এর মালিক সে ছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর পরে এখন এর মালিক হয়েছে তার উত্তরাধিকারী। আমরা মৃতের উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে এ বাতিটি জ্বালানোর অনুমতি নেয়নি। তাই বাতিটি নিভিয়ে দিয়েছি।

এই হল উত্তরাধিকারের গোড়ার কথা। তাই প্রিয়নবী (সাঃ) যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আলিমদের উপর। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অনুরূপ নবুওতীর দায়িত্ব পালন করা হল প্রকৃত উত্তরাধিকার ভোগ করার সমান। এই দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করে আল্লাহ তায়ালা আলিমদেরকে সম্মানিত করেছেন।

প্রিয়নবীর (সাঃ) দায়িত্ব কী ছিল?

আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে (সাঃ) সমগ্র পৃথিবী থেকে জুলুমের উৎখাত, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, ইনসাফ কায়েম এবং প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচিত করে তুলতে, বিশ্বময় কুরআন-হাদীসের আলো উদ্ভাসিত করতে, বস্তু ও প্রকৃতি পূজারীদের কপাল আল্লাহর সামনে ঝুঁকাতে, পৃথিবীর মানুষকে সহস্র কৃত্রিম খোদার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের ছায়ায় আশ্রয় দিতে এবং প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টির আরাধনা-বন্দনার ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে নিষ্ক্রান্ত করে এক আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত করতে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। এসব ছিল তাঁর দায়িত্ব।

সত্যের পয়গাম

এই সেই মহান দায়িত্বভার, যা তিনি হেরা গুহা থেকে প্রাপ্তির পর পালন শুরু করেছিলেন। যে মহান দায়িত্ব পালনে তাঁকে কখনও সাফা পাহাড়ে, কখনও আবী কায়েস পর্বতে, কখনও ওকবার আস্তানাসমূহে; আবার কখনও দেখা গেছে তায়েফের সবুজ জনপদে, কখনও কোন খোলা মাঠে, কখনও সাওর গুহার উপরে, কখনও দেখা গেছে শত্রুর মুকাবিলায় মুখোমুখি যুদ্ধের ময়দানে, কখনও ওহুদের রণাঙ্গনে, কখনও হুনাইনের যুদ্ধে, কখনও মক্কা, কখনও মদীনা, কখনও তাবুক ও হুদায়বিয়ায়। এভাবে সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে তিনি মানুষকে বুঝাচ্ছিলেন, সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব কর; আমরা কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কারও দাসত্ব বরণ করতে দেব না, মানুষ মানুষের গোলামী বরণ করতে পারে না; যখন মানুষ আল্লাহর দাসত্ব বরণ করবে, তখনই তার সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এভাবে সাধারণ মানুষ পরিণত হবে সোনার মানুষে। জান্নাত তার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে।

প্রিয়নবী (সাঃ) আল্লাহর প্রতিটি বিধান পালনের লক্ষ্যে ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বহু ত্যাগ ও কুরবানী বরণ করেছিলেন। মিথ্যাকে পরাভূত করে সত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি শতভাগ সফল হয়েছিলেন। সত্যের দাওয়াত নিয়ে তিনি যে কারও দরজায় কড়া নেড়েছেন, সত্যের প্রয়োজনে অশংকচিত্তে তিনি যে কোন কাজ সম্পাদন করেছেন, কোন শংকা ও অলসতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি এ মহান দায়িত্ব পালনে। এ মহান লক্ষ্য অর্জনে কোন বাধা তাঁকে অবদমিত করতে পারেনি। অজস্র পাথর নিক্ষেপে তাঁকে রক্তাক্ত করা হয়েছে, তবুও তিনি পিছু হটেননি। পাথরের আঘাতে রক্তস্নাত হয়েছেন, তবুও তিনি আপন মিশন ত্যাগ করেননি। কাফিরের আঘাতে দাঁত ভেঙ্গে গেছে, তবুও কোন নিরাশা তাঁর উপর ভর করার সুযোগ পায়নি। কোন আঘাত, আক্রমণ, যন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র তাঁকে দুর্বল ও অবদমিত করে রাখতে পারেনি। আপন চাচাকে শত্রুরা কেটে সত্তর টুকরো করেছে, তবুও নিরাশা তাঁকে ঘিরে রাখতে সক্ষম হয়নি।

তাঁকে বর্ণনাতীত নির্যাতনে জর্জরিত করা হয়েছে। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে তাঁর সচ্চরিত্রা স্ত্রীর অমলিন আঁচল মিথ্যা অপবাদে মলিন করেছে ঐ কাফির-মুনাফিক গোষ্ঠী। কত অসহনীয় ছিল সেই মিথ্যা অপবাদ। প্রিয়নবীকে (সাঃ) দমন করতে ব্যর্থ হয়ে তারা ষড়যন্ত্রের কালো হাত বাড়িয়েছিল তাঁর ঘর ও ঘরনীদের প্রতি। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা কল্পনা করা যায় কি? কোন মানুষ সহ্য করবে তার পূত চরিত্রের মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি কেউ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে? এমন জঘন্য চারিত্রিক ষড়যন্ত্রের কথা শুনলে মানুষ কেঁপে উঠে, এর প্রতিশোধে তারা লংকাকাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ে; কিন্তু এমন সঙ্গীন আপত্তিকর বিষয়েও প্রিয়নবী (সাঃ) সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ ছিলেন। তিনি একটুও বিচলিত হননি। এসব আঘাত তাঁর লক্ষ্যের পথে আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। চরম সংকটও তাঁকে বিন্দু পরিমাণ কক্ষচ্যুত করতে সফল হয়নি। তিনি ছিলেন প্রতি মুহূর্তে আপন মিশন বাস্তবায়নে বেগবান ও আপোসহীন।

শারীরিক সুস্থতার সময়ে যেভাবে তিনি দাওয়াতের কাজে নিরলস ছিলেন, অসুস্থতার সময়েও দুর্বলতা তাঁকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। এই হল আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই মাত্র তেইশ বছরে ইসলামের বিজয়ী সেনাদল ছিনিয়ে

এনেছিল রোম ও পারস্য সম্রাটদের রাজসিংহাসন। মাত্র কয়েক বছরে এরাই অলংকৃত করেছিল বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ আসন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় থেকে নিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকাল পর্যন্ত পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী দেশ ও ভূমির তাঁরাই ছিলেন একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক। দ্রুত ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। কোন শক্তি তাদের রুখে দাঁড়ানোর দুঃসাহস দেখায়নি। যেখানেই তাঁরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছে, সেখানেই মানুষ দলে দলে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ধন্য করেছে। এভাবে আফ্রিকা বিজয় করেছেন মূসা বিন নুসাইর, আমর বিন 'আসের হাতে বিজয় ঘটেছে মিসর, সিন্ধু বিজয় করেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম (রাহঃ)। যাঁরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মানের একমাত্র পথ ও পন্থা হল জিহাদ- একমাত্র জিহাদ। ইসলামের মর্যাদা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বিধান, ইসলামী শাসন– সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল এই জিহাদ।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের দায়িত্ব

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দায়িত্ব পালন করে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন, আমি পৌঁছিয়েছি কি? বারবার তিনি একথা বলে উপস্থিত সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন সকলে একবাক্যে বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! দ্বীনের সকল বিষয় আপনি আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন।"

রাসূলের (সাঃ) রক্তঝরা ইসলামের বর্তমান অনুসারী ও উম্মতের আজ অবস্থা কী? তারা আজ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বই আদায় করছে না। শতকরা পাঁচজন মুসলমান নিয়মিত নামায পড়ে না। বিশাল বিশাল মসজিদগুলো সব ফাঁকা। পক্ষান্তরে অন্যায় ও অপরাধের আড্ডা সরগরম। উপচে পড়া ভীড় দেখা যায় নিষিদ্ধ সব পল্লী, গৃহ ও এলাকায়। প্রিয়নবীর (সাঃ) প্রিয় সুন্নাত পালনকে পশ্চাদপদতা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। হারাম সুদের কারবার এতই ব্যাপক যে, কেউ এর নখরাঘাত থেকে বাঁচার ইচ্ছা করলেও সে বাঁচতে পারবে না–এ সুদী নখর তাকে রক্তাক্ত করবেই। মুসলমানদেরকে আজ বাধ্য করা হচ্ছে হারাম সুদ ব্যবহার ও ভক্ষণ করতে।

এক শ্রেণীর নামসর্বস্ব মুসলমান ইসলামী বিধান-ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় বলে তারস্বরে গালি দিচ্ছে। তারা বলতে চায়, বিংশ শতাব্দীতে ইসলাম নাকি অচল।

আজ মুসলমানরা কুরআনের তরজমা-তাফসীর দূরের কথা কুরআনের আয়াত দেখেও পড়তে জানে না। অধিকাংশ মুসলমান আজ আল্লাহর কালামের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক রাখে না। অথচ প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হল আপন জীবনকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে উজ্জ্বল করে তোলা। এই আলো ও উজ্জ্বলতার অভাবেই আজ মানব জীবন ও সমাজ জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে ঘেরা। এই জাহেলিয়াতকে তারা বলছে সভ্যতা। বিবেক বিকৃতির এর চেয়ে সরস কোন উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাবে কি?

মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানের অভাব নেই, অভাব শুধু ইসলামের আদর্শ অনুসারীর। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে মুসলমানের সংখ্যা কোটি কোটি। কিন্তু এসব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম নেই, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলামমুক্ত। কোথাও কুরআনের হুকুম কার্যকর নয়, বরং কুরআনের স্থান দখল করে আছে ইংজেরদের আইন। এর চেয়ে জঘন্য লজ্জার কথা আর কী হতে পারে বলুন!

মহামান্য আদালতের মাননীয় কোন জজকে যদি বলা হয়, জজ সাহেব! আপনার ফয়সালা কুরআনের অমুক আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, তবে সেই জজ সাহেব অবজ্ঞার হাসি হেসে বলবে, না মোল্লাজি, কুরআনের কথা বলার জায়গা আদালত নয়, ওসব কথা মসজিদে গিয়ে বলুন। এই হচ্ছে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর বাস্তব চিত্র। আজ কুরআনকে আদালত থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, সংসদ-সংবিধান থেকেও কুরআনকে বিতাড়িত করা হয়েছে; অথচ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় মুমিনরা এখনও গাফেলীর ঘুমে বিভোর। কবে ভাঙ্গবে তোমাদের ঘুম!

আমরা দিন দিন হীনমন্যতার গভীর আঁধারে ডুবে যাচ্ছি। আজ আমলদার মুসলমানকে পথেঘাটে কটুক্তি করা হয়, প্রিয়নবীর (সাঃ) উত্তরাধিকারী আলিম-উলামা ও তালিবে ইলমকে মসজিদের মোল্লা বলে ব্যঙ্গ করা হয়। তাদেরকে বলা হয় মধ্যযুগীয় বর্বর ও প্রগতি, আধুনিকতার

এক নম্বর প্রতিবন্ধক। বাজার থেকে হেঁটে গেলে কিছু লোক আছে, যারা আলিমকে দেখলে তাঁদের প্রতি অপমানজনক বাক্য ছুড়ে দেয়, বিভিন্ন ইঙ্গিত-আকারে তাদেরকে অপমানিত করে। দাড়ি ও সুন্নাতী পোশাককে তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরা জংলীপনা বলে গালি দেয়। রমযান মাসে কোন আলিম যদি কোন দোকানে কাপড় কিনতে যায়, তবে তাঁকে দেখেই দোকানী বলবে, 'আমাদের যাকাত দেয়া শেষ, চলে যান।' এরা মনে করে, যাকাত আদায় করাই আলিমদের কাজ। তাদের এই মানসিকতার জন্য আমরাই অনেকাংশে দায়ী। আমরা ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদার জন্যই যাই এবং চাঁদার উপর নির্ভর করে মাদ্রাসা চালাই। মাদ্রাসা পরিচালনায় এর চেয়ে সম্মানজনক কোন পথ কি নেই?

আমাদের কাজ কি চাঁদা আদায় করা? যাকাত ও কুরবানীর চামড়া ছাড়া কি মাদ্রাসা চলে না? যাকাত আদায়ের থলে নিয়ে ঘোরায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে কেন ছাত্রদের? ভিক্ষা করার জন্যই কি তাদের জীবন? মানুষের কাছে হাত পেতে দান গ্রহণ করাই কি আমাদের পেশা? অথচ পৃথিবী দান গ্রহীতাকে ঘৃণা করে; এই ঘৃণার শিকার আজ তালিবে ইলম ও আলিম সমাজ। এসব কারণে তারা আজ চরমভাবে হীনমন্যতায় ভুগছে। তালিবে ইল্‌মরা মাদ্রাসার বাইরে গেলে মাথার টুপি খুলে পকেটে রাখে। ওস্তাদদের বিশেষ তাকিদ সত্ত্বেও ছাত্ররা দাড়ি মুণ্ডন করে, ছোট করে রাখে। অনেক ছাত্র আজ দাড়ি রাখা লজ্জা ও নোংরামি মনে করে।

কেন সৃষ্টি হয়েছে মাদ্রাসা ছাত্রদের মাঝে এই হীনমানসিকতা? কেন মুসলমানরা নামায আদায় করে না? ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা সুদের সয়লাভ থেকে রক্ষা পাচ্ছি না? সুদ খেতে কেন আমরা বাধ্য হচ্ছি? সম্মানিত আলিম সমাজ কেন আজ অমর্যাদা ও হীনমন্যতার শিকার? মুস-লমানদের এই সামগ্রিক গ্লানিকর পরিস্থিতির প্রতিকার কি, তা খুঁজে বের করতে হবে অবশ্যই। তাই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাতায়।

করাচীর অভিজাত ক্লিফটন এলাকার রাস্তা দিয়ে জনৈক মাওলানা সাহেব হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন বহু যুবক-যুবতী সেখানে স্ফূর্তিতে মেতে ছিল। তাদের মধ্য থেকে এক যুবতী মদের বোতল খুলে দৌড়ে এসে মাওলানা সাহেবের মুখে দাড়িতে ঢেলে দিয়ে চলে যায়। এভাবে আলিমরা পথে-ঘাটে লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রতিদিন।

লাহোরে আমাদের সাংগঠনিক সভায় একবার এমন এক কাশ্মিরী উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী। হৃদয়ের দহন ও যন্ত্রণায় সব ছেড়ে পাকিস্তান হিজরত করেছেন। কাশ্মীরে মুসলমানদের অবস্থার বিবরণ শোনানোর সময় কান্নায় বারবার তার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কথাগুলো বলতে যদিও আমার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে আসছে, তবুও বলতে বাধ্য। নতুবা কাশ্মীরের মুসলমানরা কেমন আছে, তা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমি এ জন্যই বলছি, যাতে এ ঘটনা শোনার পর মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারা যেন গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে, কী ঘটছে কাশ্মীরের জনপদে, প্রতিটি পরিবারে ও ঘরে।

তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বর্বর আবু জাহেলের জঘন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। আবু জাহেল তাঁর জননেন্দ্রিয়ে বর্শা ঢুকিয়ে চরম নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁকে শহীদ করেছিল। এর চেয়ে বহুগুণ বেশী অত্যাচার চলছে আজ কাশ্মীরের মা-বোনদের উপর। বড়ই করুণ আজ কাশ্মীরের অবস্থা।

একটি ঘটনা শুনুন। এক মুসলিম পরিবারে ভারতীয় সেনারা প্রবেশ করে। প্রথমে তারা ঘরের পুরুষদেরকে বেঁধে ফেলে। এবার এক যুবতীকে তাদের সামনে উলঙ্গ করে। শক্ত রশিতে বাঁধা হয়েছে যুবতীর বাপ ও ভাইকে। তাদের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে এই নারকীয় কাণ্ড। উলঙ্গ যুবতীর জননেন্দ্রিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে গুলী করে সেখানেই তারা তাকে শহীদ করে। এর আগে বাপ-ভাইয়ের সামনে তার উপর যে পাশবিক বলাৎকার করা হয়েছে, তা বলতে মুখ আটকে যাচ্ছে। একথা বলে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেলেন।

এসব ঘটছে যুদ্ধরত কাশ্মীরে। এসব ঘটছে আজ আযাদীর সংগ্রামরত প্রতিটি মুসলিম জনপদে। আমাদের দেশেও কি এসব পাশবিকতা কম ঘটছে? বিভিন্ন কৌশলে মুসলিম নারীদেরকে উলঙ্গ-অর্ধনগ্ন করা হচ্ছে। যৌবন ও শরীর বিক্রেতাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার বছরের মেয়ে শিশু পর্যন্ত নরপশুদের যৌন লালসার শিকার হচ্ছে। অথচ এটি মুসলিম দেশ। এভাবে দিন দিন ইজ্জত-সম্ভ্রম ও মর্যাদা লুটে খাচ্ছে ভেতর-বাইরের হায়েনার দল। তবুও নেতা-নেত্রীরা আল্লাহর আইনের আশ্রয় নেবে না। আলিম-উলামাকে আহ্বান করে এ কঠিন সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করবে না, মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়নে মনোযোগ

দেবে না। কেননা তারা জানে, যদি ইসলামী আন্দোলন হয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ সূচিত হয়; তবে তা এই মাদ্রাসা থেকে শুরু হবে। এরাই এর নেতৃত্ব দেবে। আর যদি ইসলাম কায়েম হয়, তবে এই দূরাচারদের কঠোর বিচার হবে, তাদের মাথা গোজার ঠাঁই হবে না এই জনপদে। তারা জানে, মাওলানা আরসালান খান রহমানী, মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী ও মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এই মাদ্রাসারই ছাত্র-শিক্ষক। তারা জিহাদে অবতীর্ণ হলে বিজয় অর্জন করেই তবে ক্ষান্ত হবে। তাই ওরা চরম আক্রোশে মাদ্রাসা বন্ধ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। ওদের এই হীন চক্রান্ত অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

ওরা ইসলামকে নিয়ে উপহাস করে। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে কুধারণার সৃষ্টি করে।

ইসলামকে হেয় ও সমালোচিত করার কুমতলবে কোথাও বলা হয়, কোন গাড়ী চালক দুর্ঘটনা ঘটালে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী তাকে একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। আবার তারাই বলে এ বিচার অমানবিক, মানা অসম্ভব।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার হাজার হাজার সুন্দর বিষয়গুলো বাদ দিয়ে এরা গাড়ী চালকের দুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যায় মেতে উঠেছে। ইসলামের সৌন্দর্য আদৌ এদের চোখে পড়ে না।

কেন শুধু গাড়ী চালকের দুর্ঘটনার বিষয়টি ইসলামের নামে প্রয়োগ করা হচ্ছে? তা-ও আবার বিকৃতরূপে? এর উদ্দেশ্য হল, ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কুধারণার সৃষ্টি করা।

যদি এদের উদ্দেশ্য সৎ হত, তবে জাতীয় এসেম্বলীসহ রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। যদি এদের উদ্দেশ্য সৎ হত, তবে কেন তারা বিচারব্যবস্থা ইসলামী বিধানের আলোকে প্রণয়ন করছে না? কেন সচিবালয় ইসলামী আদর্শের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে না? কেন শিক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থায় এখন ইসলাম অনুপস্থিত?

আসলে গাড়ী চালকদের উপর ইসলামের নামে এই বিচার চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হল, এর বিরোধিতায় তারা অবশ্যই হরতাল করবে, রাস্তা অবরোধ করবে, ব্যাপক ভাংচুর চালাবে। তখন শাসকগোষ্ঠী ইসলাম অনুরাগী লোকদেরকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলবে, দেখ, চরম সভ্যতার এ যুগে মধ্যযুগীয় ইসলামী আইন প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, উপরন্তু ইসলামের বিধানাবলীতে সংশোধনী গ্রহণ করা একান্ত দরকার।

ইসলাম সম্পর্কে মূর্খদের কি জঘন্য উপহাস!

এসব হল আলিম-উলামা, তালিবে ইল্‌ম ও ইসলাম অনুরাগী লোকদের একঘরে, কোণঠাসা করে রাখার জঘন্য হাতিয়ার। এদের মসজিদ ও মাদ্রাসায় বন্দী করে রাখার এক অপকৌশল। এই ইসলাম বিরোধী ক্ষমতাসীন চক্র জানে, যদি এরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়, তবে ওদের রক্ষা নেই। তাই ওরা ইসলাম বিরোধিতায় যোগ করছে নতুন নতুন মাত্রা ও কৌশল।

এই অপকর্মের প্রতিকার কি?

আমরা কি নীরবে এসব অপকর্ম সহ্য করে নিরাপদে পৃথিবী থেকে বিদায়ের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করব? আমরা কি এমন মুসলমান হয়ে থাকব যে, নামে মুসলমান বটে, কিন্তু কলেমাটাও জানা থাকবে না? যে কুরআন আমাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে, সে কুরআন না বুঝেই কি আমরা কবরের পথে যাত্রা করব? ভেবে দেখেছি কি, কোথায় হবে আমাদের শেষ ঠিকানা?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ জটিল সমস্যার সুন্দর সমাধান ব্যক্ত করেছেন এবং যারা কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর নিঃসীম শক্তি হৃদয়ে ধারণ করে, তাদেরকে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, তোমাদের বহু শত্রুর মাঝে এক জঘন্য শত্রু রয়েছে, যার নাম হল, 'কাফির'। এই কাফির গোষ্ঠীর সর্বক্ষণের চেষ্টা হল, তোমাদেরকে ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা। কাফিরের দিন-রাত চেষ্টা হল, কিভাবে তোমাদের কাফির বানান যায়, অথবা কিভাবে তোমাদের ঈমানহীন বা নামেমাত্র মুসলমানে রূপান্তরিত করা যায়।

এই কাফির গোষ্ঠীর সংশ্রব থেকে তাই তোমাদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। খোলা ময়দানে এদের সকল অপচেষ্টার মোকাবেলা করা জরুরী দায়িত্ব। যদি তোমরা এদের সাথে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে চল, তবে এরা অবশ্যই তোমাদের নিশ্চিহ্ন ও পরাজিত করেই ক্ষান্ত হবে।

তাই আমরা যখন ইসলাম বিরোধী ও কাফির গোষ্ঠীর মুকাবিলায় রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা ত্যাগ করেছি। তখন থেকে তারা মুসলমানদের গোলামে পরিণত করার চেষ্টায় রত হয়েছে, এ চেষ্টা ও কৌশলে তারা এখন চরম সাফল্য অর্জন করেছে। ফলে মুসলিম শক্তি দিন দিন গৌরব ও

বীর্যহীন হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর সকল সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুরক্ত বান্দা মুসলমানদেরই ব্যবহারের জন্য দান করেছেন, যে পৃথিবীর বৈধ উত্তরাধিকারী একমাত্র মুসলিম জনতা, সেই যমীন ও সম্পদ কাফিররা দখল করে নিয়েছে। আমাদের পেট্রোলিয়ামের বিশাল মওজুদ আজ কাফিররা নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন তারা মুসলিম দেশগুলোর মানচিত্র ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে আসছে। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে চরম দারিদ্রের শিকার করে চির গোলাম বানাতে চাচ্ছে।

মুসলমানদেরকে গোলামে পরিণত করার চক্রান্ত

উত্তর পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার মুসলমান শুধু এ কারণে ভ্রান্ত কাদিয়ানী ধর্মমত গ্রহণ করে কাফির হয়েছে যে, কাদিয়ানীরা তাদেরকে এক জোড়া করে জামা-পাজামা দান করেছে।

উত্তর উজিরিস্তানের চিত্রাল ও গিলগিতের লাখ লাখ মানুষ ইসলামী ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে আগাখানী ধর্ম গ্রহণ করেছে এ কারণে যে, আগাখান তাদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করে তাদের বিশেষ উপকার করেছে। (এ দেশের খৃস্টান মিশনারী ও ইসলাম বিরোধী এনজিওদের টোপ গিলে ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যে আপন নির্মল ইসলামী বিশ্বাস বিসর্জন দিয়েছে, তা এখন কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই) এভাবে অভাবের তাড়নায় দেশে দেশে মুসলমানরা অতি সহজে আপন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে কাফির হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের সকল কুফরী শক্তি একজোট বেঁধে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে, যেন মুসলমানরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা লাভ করতে না পারে।

ওরা মুসলিম আলিম-উলামা ও নেতৃবৃন্দের মাঝে অনৈক্যের বীজ বপণ করেছে। আলিমদের প্রতি সাধারণ জনতাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। ইসলামী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও ওয়াজ মাহফিলে বসে আলিমদের মূল্যবান বক্তব্য শুনার প্রতি দারুণভাবে অনুৎসাহিত করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, আ-লিম-উলামা ও সাধারণ জনতার মাঝে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

যখন মুসলিম জনতা আলিমদের থেকে দূরে থাকবে, তখন তারা ইলম থেকে বঞ্চিত হবে। ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তারা ইসলাম ও দ্বীন থেকে ছিটকে পড়বে। দ্বীনের সাথে মুসলমানের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা কাফিরের শিকারে পরিণত হবে। প্রতিটি মুসলিম দেশে ওরা এই একই প্রক্রিয়ার কাজ করছে। মুসলমানের হৃদয় থেকে ইসলামী

বিশ্বাস নির্মূল করার লক্ষ্যে যত উপকরণ দরকার, তা সবই ওরা অতি সস্তায় সরবরাহ করে যাচ্ছে। মুসলমানের ঘরে ঘরে ওরা টেলিভিশন ঢুকাতে সক্ষম হয়েছে। যারা ঘরে টেলিভিশন তুলেছে, কিছুদিন পর তাদের ঘরে ভিসিআর দেখা যাচ্ছে, যা মুসলমানের ঈমান-ইজ্জত ও লজ্জাকে ধী-রলয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এভাবে ঈমান ধ্বংসের উপকরণকে ওরা সহজলভ্য করে তুলেছে। ফলে দিন দিন মুসলমানরা ঈমানহারা হচ্ছে, মুসলমানরাই এখন ইসলাম বিরোধিতায় কাফিরের চেয়েও মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ দুঃখ গোপন করার কোন উপায় আছে?

ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন সকল সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন

আল্লাহর কসম, আজ যদি আমরা কাফিরের বেড়াজাল ভেঙ্গে ইসলামী আদর্শ কায়েম করি, তবেই আমরা হালাল উপার্জনে সক্ষম হব। তখনই আমরা নামাযের মাঝে যথার্থ স্বাদ পাব, নামাযের মধ্যেই আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারব, সুদ-ঘুষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাব। সমাজে আলিমদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের মজলিসে এক মুহূর্ত বসে লোক নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে। আলিমের নসীহত শুনে মানুষ নিজেকে সোনার মানুষে পরিণত করার সুযোগ পাবে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হল সকল সমস্যা ও সংকটের সমাধান। সামাজিক রোগ-ব্যাধির একমাত্র সফল চিকিৎসা হল ইসলামী আদর্শ কায়েম করা।

কে কায়েম করবে ইসলামী সমাজব্যবস্থা? আল্লাহর নবী (সঃ) নিজে এই সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। এখন তা কায়েম করবে তারই উত্তরসূরী আলিম-উলামা। আর এই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন, যাতে ব্যবহার করতে হয় তরবারী ও সামরিক সরঞ্জাম। কেননা জবাহ করার মাধ্যমে পশুর শরীর থেকে অপবিত্র রক্ত বের করতে যেভাবে চাকুর দরকার হয়, ঠিক সেভাবে জিহাদের মাধ্যমে সমাজ থেকে কাফির-মুনাফিকদের অপসারিত করার দরকার হয়। চাকুর ব্যবহার ছাড়া যদি একটি মুরগীকেও পবিত্র করা না যায়, তবে কিভাবে সম্ভব তরবারীর ব্যবহার ছাড়া একটি সমাজকে পবিত্র করা? না সম্ভব নয়। তাই চাকু

ব্যবহার করে মুরগী জবাহ্ করা যেমন নিয়ম ও উচিত কাজ, ঠিক তেমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষে তরবারী ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক ও আল্লাহর নির্দেশ। এ নিয়মের কোন বিকল্প নেই।

একজনের শরীরে ক্যান্সার হয়েছে। চরম আশংকা দেখা দিয়েছে, এই ক্যান্সার তার সারা শরীর আক্রান্ত করবে। তাকে ডাক্তারের কাছে নেয়া হল। ডাক্তার বল্‌ল, তাকে অপারেশন করতে হবে- ক্যান্সারের ক্ষতস্থান চাকু দিয়ে কেটে পরিষ্কার করতে হবে। তখন যদি বলা হয়, ডাক্তার সাহেব! আপনি বিদ্যান ব্যক্তি, কেন আপনি চাকু দিয়ে মানুষের শরীর কাটার কথা বলছেন? ডাক্তার সাহেবকে ও-ভাবে বলা ঠিক না ভুল হবে? অবশ্যই ভুল হবে। উপরন্তু ডাক্তার সাহেবের নৈতিক দায়িত্ব হল ক্যান্সারের ক্ষতস্থান কেটে পরিষ্কার করা, নতুবা দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, প্রয়োজনে ধারাল চাকু দিয়ে শরীর কেটে ফেলাও প্রশংসনীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। অতএব, কেন বলা হয় যে, আলিম-উলামা ও মুজাহিদরা কেন ক্লাশিনকভ ও যুদ্ধ জিহাদের কথা বলে?

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় লিখেছেন, 'যে কারও আমল শেষ হতে পারে, কিন্তু মুজাহিদের আমল শেষ হবে না। সে তার আমলের সওয়াব পাবে কিয়ামত পর্যন্ত, সে যে এলাকা বিজয় করবে, সে যে এলাকায় ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করবে, কিয়ামত পর্যন্ত সে এলাকার মুসলমান যতগুলো ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল আদায় করবে, প্রত্যেক মুজাহিদ তার সওয়াব পেতে থাকবে।'

তাই মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা তার মমত্ব প্রকাশ করে বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

'আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।' (সূরা ঃ সফ – আয়াত ঃ ৪)

যারা আল্লাহ-প্রেমের দাবী করে, তারা আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে যুদ্ধ ও জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়।

কোথাও মুজাহিদকে আল্লাহ তা'আলা ওলী বলে আখ্যায়িত করেছেন, এবং বলেছেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ –

'আর বহু নবী ছিল, যাদের সাথে আল্লাহর ওলীগণ তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে।' (সূরা ঃ আলে ইমরান ঃ আয়াত – ১৪৬)

জিহাদে রয়েছে সম্মান

জিহাদে অবতীর্ণ ও জিহাদ বিজয়ের পর আলিমগণ মর্যাদা ও গুরুত্বের দাবীদার হবে, তাঁরা মহাসম্মানীয়রূপে বিবেচিত হবে। আলিম-উলামা জিহাদের মাধ্যমে সম্মানার্জনের চিন্তা না করলেও আল্লাহ তাদেরকে সম্মান দান করবেন এবং দ্বীন আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠা পাবে, এর চেয়ে মুসলমানের জন্য বড় পাওয়া কী হতে পারে?

প্রিয়নবীর (সঃ) দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রতিটি মুসলমানের ফরয দায়িত্ব। আল্লাহর কিতাব কুরআনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা আমার ও আপনার সকলের উপর ফরয।

যেমন প্রিয়নবী (সাঃ) মিহরাবে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেছেন, তেমনি বদরের ময়দানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে প্রত্যেক আলিমের কর্তব্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আপন দায়িত্ব পালন করা। নতুবা এই ফরয পালন না করার ফলে কী জবাব দিবে আল্লাহর কাছে?

জিহাদে রয়েছে সম্মান, প্রভাব ও মর্যাদা। আফগান জিহাদের প্রসিদ্ধ কমান্ডার মাওলানা ইউনুস খালেস আমেরিকা গেলে প্রথমবার তিনি প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সাথে দেখা করেননি। দ্বিতীয়বার রিগ্যানের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁর দোভাষীকে বলেন, তুমি তাকে বল, "সে যেন এখনই ইসলামের কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। এবং তাকে বল, এতেই তোমার জন্য উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তুমি যদি কলেমা পড়, তবে তুমি তো সওয়াব পাবেই, উপকৃত হবেই, উপরন্তু তোমার কারণে যেসব আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের সওয়াবও তুমি পাবে। তুমি যদি কলেমা না পড়, ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তুমি আল্লাহর অভিশম্পাতপ্রাপ্ত হবে, তোমার কারণে আর যারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হল, তাদের পাপেরও তুমি অংশীদার হবে।"

দোভাষী মাওলানার দাওয়াত অক্ষরে অক্ষরে মিঃ রিগ্যানের সামনে তুলে ধরল। রিগ্যান মাথা ঝুঁকিয়ে তার পাশে বসে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব! আমরা তাদেরকে সাহায্য দিচ্ছি, আর তারা কিনা আমাদেরকেই ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে!' কথাগুলো বিড়বিড় করে বললেন মিঃ রিগ্যান।

কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, মাওলানা, আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন? তিনি বলেন, 'আমি একজন আলিম, প্রিয়নবীর (সঃ) উত্তরাধিকারী। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর বিখ্যাত সব বাদশাহকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহর প্রশ্নের সম্মুখীন না হই যে, মৌলভী ইউনুস খালেস! তুমিও তো বোখারী পড়েছিলে, নবীর দাওয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলে। তুমি কি নবীব এই কর্মসূচীটি পালন করেছিলে? সুযোগ পেয়েও রিগ্যানকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলে?

আমি এই প্রশ্নটি মনে রেখে নবী (সঃ)-এর মহান সুন্নাত পালনে সাহসী হয়েছি, যেভাবে প্রিয়নবী (সঃ) ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিয়েছিলেন কায়সার ও কেসরাকে।'

এই অসামান্য সাহস ও মর্যাদা তারাই বুকে লালন করে, যারা ইসলামের জন্য অকাতরে খুন দিতে পারে। আল্লাহর নিকট রয়েছে এদের সীমাহীন মর্যাদা ও বেহেশতের সুউচ্চাসন।

প্রিয় বন্ধুরা! আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশায় আমাদেরও প্রিয়নবীর (সাঃ) অনুসরণ করতে হবে। নবীর (সাঃ) প্রতিটি সুন্নাত জীবন-বাজি রেখে পালন ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসলমান হিসাবে আমাদেরও সমরাস্ত্র ও তরবারী চালনা শিখতে হবে, যেভাবে প্রিয়নবী (সাঃ) তরবারী চালিয়েছেন। আমাদের সমর-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, যেভাবে প্রিয়নবী (সাঃ) কাফির-মুশরিক ও ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় তরবারী হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় অর্জন করেছিলেন। আমাদের শাহাদাত-বরণের আকাংখা পোষণ করতে হবে, যেভাবে শাহাদাতের আকাংখা পোষণ করতেন প্রিয়নবী (সাঃ)।

ইসলামী বিপ্লব ও বিজয়ের জন্য আমাদেরও জিহাদের পথেই অগ্রসর হতে হবে, যে জিহাদ–বিজয়ের মাধ্যমে প্রিয়নবী (সাঃ) ইসলামকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য নসীব করুন এবং বিশ্বময় ইসলামের বিজয় দান করুন।

জিহাদের বায়‘আত

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।”

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যাকে ‘বায়‘আতে রিদ্‌ওয়ান’ বলা হয়ে থাকে। ইসলামী ইতিহাসের এ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনাটি ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তখন হুজুর (সাঃ) এক স্বপ্ন দেখে সে অনুযায়ী চৌদ্দশত সাহাবীকে সাথে নিয়ে কুরবানীর পশুসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন।

মক্কার মুশরিকরা ছিল মুসলিম শত্রুতায় অন্ধত্বের শিকার। তারা পথিমধ্যে এই হজ্ব কাফেলার রাস্তা আগলে দাঁড়াল। অথচ হজ্ব যাত্রীদের হয়রানি করা ও পথ আগলে রাখা ছিল চরম অন্যায় ও অনিয়ম। তাদেরকে এ সফরের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলার জন্য প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত ওসমানকে (রাঃ) মক্কা পাঠালেন। তিনি মক্কার মুশরিকদের বুঝাবেন যে, তারা কেবল ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছে, কোন যুদ্ধ সংঘটন ও মক্কা দখ-লের ইচ্ছা তাদের নেই। তারা ওমরা পালন শেষে চলে যাবে।

আর যে সকল মুসলমান এখনও মক্কার বসবাস করছেন, তিনি তাদেরকে এ সুসংবাদ জানাবেন যে, অতিসত্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অসম্মানজনক জীবনের অবসান ঘটিয়ে নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কায় পৌঁছলে মক্কায় মুশরিকরা তাকে আগলে রাখে। এদিকে লোকের মুখে ব্যাপকভাবে শোনা যাচ্ছিল যে, হযরত ওসমানকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।

একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য

এবার বিষয়টি একজন মুসলমানের রক্তের মূল্য আদায়ের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনারা জানেন, একজন মুসলমানের রক্ত, জীবন ও মর্যাদার মূল্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বেশী।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"যদি কা'বার সকল ইট বিক্রি করা হয় (অথচ কা'বার একখানা ইটের মূল্য আদায়ের সামর্থ পৃথিবীর কারও নেই) তবুও একজন মুসল-মানের ইজ্জতের সমান তার মূল্য হবে না।"

আল্লাহর নিকট মুসলমানের মর্যাদা কল্পনাতীত বেশী।

আমাদের সমাজে এসব বিষয় অতি মামুলী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, কোথাও একজন প্রতিনিধি পাঠানো হল এবং সে নিহত হল; সামান্য প্রতিক্রিয়া, অতঃপর সব নীরব। আমাদের দেশে হাজার হাজার মানুষ মরে গেলেও সামান্য অনুশোচনা পরিলক্ষিত হয় না অধিকাংশের মনে। লাখো মানুষের ইজ্জত লুণ্ঠিত হলেও হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ ব্যথা অনুভূত হয় না।

কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী, তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবা কিরাম; তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, আমাদের কাউকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আর যদি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়, তবে এ জীবনের মূল্য থাকে কি। কি মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকার?

আজ যদি এক মুসলিমের রক্ত ও জীবন এভাবে এত সস্তায় বিকিয়ে যায়,তবে কাল যেখানে সেখানে মুসলমানকে হত্যা করতে কেউ এতটুকু ইতস্তত করবে না। যে কেউ যখন তখন মুসলমানের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। তামাশাচ্ছলেও তারা মুসলমানের গর্দান উড়িয়ে দিতে থাকবে। তরবারীর তেজ পরীক্ষা করে দেখার সখ হল, ব্যস মুসলমানের ঘাড়ে মেরে দিল। এমনি এক অমর্যাদাকর পরিস্থিতির শিকার হবে সকল এলাকার মুসলমানরা। অতএব এখনই এর প্রতিবিধান দরকার। এমন

অবস্থায় আমরা নীরব থাকতে পারি না। এমন যুলুমকে আমরা বরদাশত করতে পারি না। আমরা সমাজ থেকে এমন অপরাধকে নির্মূল করেই ক্ষান্ত হব। যদি এ অপরাধকে নির্মূল করতে আমাদের মরতেও হয়, তবে আমরা সে মরণকেই বরণ করে নেব; কিন্তু জালিমকে রেহাই দেয়া যাবে না।

প্রিয়নবী (সাঃ) ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার সংবাদ শুনেই একটি গাছের তলায় বসে গেলেন। তিনি সাহাবীদের থেকে এক চরম অঙ্গীকার নিতে থাকলেন– কী সে চরম অঙ্গীকার?

মরণের অঙ্গীকার

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ)-এর নিকট ইয়াজিদ ইবনে আবু আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ বিষয়ের উপর আপনারা (সেদিন) শপথ গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, "মৃত্যুর অঙ্গীকার।" (সহীহ বুখারী ঃ পৃঃ ১৫, খঃ ১)।

রাসূলের (সাঃ) নিকট তাঁরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন, "মরে যাব তবু ওসমান (রাঃ)-এর রক্ত বৃথা যেতে দেব না। তার রক্তের বদলা নিয়েই ছাড়ব।"

হযরত ইবনে ওমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ বিষয়ের উপর আপনারা সেদিন বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বলেন, "আমরা সবরের উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলাম, আমরা শপথ গ্রহণ করেছিলাম যে, শত্রু পক্ষ যতই শক্তিশালী হোক আমরা ময়দান ত্যাগ করে চলে যাব না।" (সহীহ বুখারী, পৃঃ ৪১৫, খঃ ১)।

সে যাত্রায় সাহাবীগণের যুদ্ধ করার কোনই ইচ্ছা ছিল না। পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রও তাদের নিকট ছিল না। তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একখানা করে তরবারী মাত্র, যা তাদের সাথে সব সময়ই থাকে।

তারা এখন ঘরবাড়ী থেকে বহু দূরে, উপরন্তু শত্রুর কবলে অবস্থান করছে, শত্রুর ঘরবাড়ী একেবারে কাছে। তা ছাড়া এখানে যুদ্ধ হলে তা কা'বার হেরেমের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হবে। প্রিয়নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথীগণ অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতির শিকার হলেন। তাই আল্লাহর নবী বাধ্য হলেন কাফিরদের সাথে মোকাবেলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে। একজন মুসলমানের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠায় কা'বার সীমানার মধ্যেই তিনি

যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মনস্ত করলেন। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, একজন মুসলমানের জীবন ও ইজ্জত কত মূল্যবান বিষয়।

আল্লাহর নবী বৃক্ষের নীচে বসে আছেন। সাহাবীগণ বলছেন, তখন ক্ষোভে তাঁর শরীর বারবার ঝাঁকিয়ে উঠছে। এক একজন করে সাহাবী এসে সুদৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রিয়নবীর হাতে শপথ করছেন যে, কোন অবস্থায়ই আমরা ময়দান ত্যাগ করব না। শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত শত্রুর মোকাবিলায় লড়ে যাব। ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের চরমভাবে বুঝিয়ে দেব, মুসলমানের জীবন ও ইজ্জত কোন সস্তা জিনিস নয়।

হযরত ওমর (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে দৌঁড়ে এসে রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। সকল সাহাবীর শপথ গ্রহণ শেষ। তখন আল্লাহর নবী (সাঃ) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন, "আমি ওসমানের পক্ষ থেকে শপথ গ্রহণ করছি।"

সন্তুষ্টির পয়গাম

একদিকে শপথ অনুষ্ঠান চলছিল, অপরদিকে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হল, হে জিবরাইল! এখনি যেয়ে আমার হাবীবকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও ঃ "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে জিহাদের বায়'আত করল। আমরণ যুদ্ধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। জিহাদের ময়দান ত্যাগ না করার শপথ করল।"

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের সাথে সাথে ওয়াদা করলেন ঃ "বিজয় লাভের সকল দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।"

বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হল

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে তাঁরা মদীনায় ফিরে গেলেন। অতঃপর ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয় হল। ৮ম হিজরীতে বিজয় হল সম্পূর্ণ মক্কা। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"

তাদের বিজয়ের গতি অব্যাহত রইল। পরক্ষণেই হুনাইন বিজয় হল,

তায়িফ দখলে আসল। মুতার ময়দানে সাহাবা কিরাম যুদ্ধে লিপ্ত, তাবুকে যুদ্ধ চলছে, ইসলামদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, যাকাত অস্বীকারকারীদের চরমভাবে দমন করা হয়েছে, মিথ্যা নবী দাবীদারদের পরাজিত করে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দেয়া হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে প্রকাশ্যতঃ মুসলমানদের পরাজিত মনে হয় বটে, কিন্তু চৌদ্দশত সাহাবীর প্রিয়নবীর (সাঃ) হাতে বায়'আত গ্রহণ এবং তাদের জিহাদের অঙ্গীকার ও জীবন বাজি রেখে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জযবা দেখে আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যৎ বিজয়ের সকল পথ তাদের জন্য খুলে দিলেন।

কাফের ভয় পেয়ে গেল

সাহাবা কিরামের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও ঐতিহাসিক। একের থেকে অপরের শপথ ছিল আরও মযবুত। প্রত্যেকের মুখেই তখন এ পংক্তি দু'টি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

نَحْنُ الذينَ بايعُوا مُحَمَّدًا علي الجِهادِ ما بَقِينا ابدا

"আমরা তো তারা, যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে শপথ গ্রহণ করেছি যে, যতদিন বেঁচে থাকব জিহাদ করব, জিহাদ ত্যাগ করব না মরণ না আসা পর্যন্ত।"

এদিকে মক্কার মুশরিকদের নিকট সংবাদ পৌঁছে গেল যে, মুসলমানরা আমরণ জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছে এবং তাদের সাথে একটি চুক্তিও হয়েছে। আর কাফিররা বিশ্বাস করে, মুসলমান কখনও চুক্তি ভঙ্গ করে না। এরপর তারা প্রকাশ করে যে, ওসমান জীবিত আছে এবং তাদের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নেই। অথচ এর পূর্বক্ষণেও তারা যুদ্ধের প্রস্তুতিসহ তরবারী নিয়ে টহল দিচ্ছিল, তীর ও নেজায় ধার দিচ্ছিল; এই দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানদের হত্যা করার ইচ্ছা ছিল তাদের অত্যন্ত সুদৃঢ়। কিন্তু জিহাদের বায়'আতের সংবাদ শুনে তাদের সকল বদ মতলব ধূলায় মিলিয়ে যায়।

অস্ত্রসজ্জিত কাফিররা ভয় পেয়ে গেল, মুসলমানদের জিহাদে অবতরণের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কথা শুনে। তারা যুদ্ধের পরিকল্পনা শিকেয় তুলে রাখল। বিশ্বাসে সুদৃঢ় এই সকল সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

"এ সকল লোক যারা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে এবং চুক্তি সম্পাদনে আপনার সঙ্গী হয়েছে, মূলত তারা আল্লাহরই সাথে বায়আত ও চুক্তি করেছে।"

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

"আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।" (সূরা ঃ ফাতাহ-আয়াত ঃ ১০)।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে, সে আল্লাহরই নিকট বায়'আত করেছে। আর যে আল্লাহর নিকট বায়'আত করেছে, পৃথিবীতে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

জিহাদের বায়'আত এবং মুনাফিক চক্র

আপনি কুরআন শরীফ খুলে দেখুন, যেখানে জিহাদের আলোচনা এসেছে, সেখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে দু'চার কথা অবশ্যই উল্লেখিত হয়েছে যে, তারা জিহাদ থেকে পেছনে থাকতে পারার ফলে আনন্দিত হত এবং যখন মুসলমানের বিজয় দেখত, তখন তাদের সাথী হওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠত। মুনাফিকদের চরিত্রই হল, 'সময়ে সরব অসময়ে নীরব'। বিপদের সময় পেছনে থাকা এবং বুদ্ধি করে পেছনে থাকতে পারার কারণে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করা।

প্রিয়নবী (সাঃ) জিহাদের উদ্দেশ্যে তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলে মুনাফিকরা এ চিন্তা করে আনন্দিত হয়েছিল যে, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় সুনিশ্চিত। ফলে আর মুহাম্মাদের (সাঃ) মদীনায় ফিরে আসা ভাগ্যে হবে না। সেই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

فَرِحَ الْمُنَافِقُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

"পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে।"

উপরন্তু এই মুনাফিক চক্র কেবল নিজেরাই বিভিন্ন বাহানা দেখিয়ে

জিহাদ থেকে পিছনে থাকত না বরং অন্যান্য লোকদেরও তারা বিভিন্ন কৌশলে জিহাদ থেকে বিরত রাখত। এ আয়াতাংশে সে কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ

"এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।"

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, হে নবী! আপনি এই সব হতভাগাদের বলে দিন ঃ

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا

"উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম।" (তাওবা ঃ আয়াত ৩১)

অযৌক্তিক কারণে জিহাদে যোগদান না করার ফলে যে প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনে তোমাদের নিক্ষেপ করা হবে, সে আগুন পৃথিবীর এই সামান্য গরমের চেয়ে বহু পরিমাণে বেশী ভয়াবহ।

বায়‘আতের হুকুম কে দিয়েছেন ঃ

উপরোক্ত আয়াতের পরে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বর্ণনা করে বলেছেন, তারা আল্লাহর নিকট বায়‘আত গ্রহণ করেছে। তবে কথা থাকে যে, তাদেরকে এই ঐতিহাসিক বায়‘আতের দাওয়াত ও হুকুম কে দিয়েছেন?

সে কথাই পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।" (তাওবা ঃ আয়াত ঃ ১১১)

আপনারা জানেন, ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় দু'টি জিনিসের দরকার হয়– এক. টাকা-পয়সা, দুই. মাল-সওদা।

এ দু'টি জিনিসের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশী? টাকা-পয়সার না সওদার?

মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে সওদার মূল্য বেশী। পকেটে পয়সা আছে; কিন্তু হোটেলে ভাত নেই, এ অবস্থায় পয়সা দ্বারা কি উপকার হয়? পয়সা পকেটে থাকলে ক্ষুদা লাগবে না এমন কথা কেউ বলবে না।

টাকা আছে; কিন্তু বাজারে খাট-পালংক ও বিছানা-কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। তখন কেউ কি টাকা বিছিয়ে ঘুমাবে? এ ক্ষেত্রে টাকা উপকারে আসল না বলাই ঠিক হবে।

তাই ক্রয় করতে হয় সর্বক্ষেত্রে যা আসল উদ্দেশ্য হয়। যে কারণে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে 'মূল্য' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা দামী ও অতি মূল্যবান। পক্ষান্তরে আমাদের জীবন ও সম্পদকে 'বিক্রয়ের জিনিস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা হল আসল ও উদ্দেশ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, আমাদের জীবন ও সম্পদকে জান্নাতের চেয়ে মূল্যবান প্রতিপন্ন করছেন আল্লাহ তায়ালা নিজেই।

কথাটি কি এভাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজ জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করেছ। না, এমন বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনের জীবন ও সম্পদকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।

খরিদদার হলেন স্বয়ং আল্লাহ, বিক্রেতা আমরা, বিনিময় হল জান্নাত এবং বিক্রিত দ্রব্য হল, আমার জীবন ও সম্পদ।

আমাদের ক্ষুদ্র জীবন ও ধ্বংসশীল সম্পদকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের চেয়ে বহু দামী প্রতিপন্ন করে নিজেই তার ক্রেতা হয়ে গেলেন। চিন্তা করে দেখুন, আমাদের জীবন কি কোন মূল্যহীন ও খেলার জিনিস?

এই ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্র কি?

এই ক্রয়-বিক্রয় কি ঘরে বা কোন দোকানে বসে হবে? আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তায়ালা সে কথাই বলেছেন ঃ

يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতপর মারে ও মরে'।

তাই তোমাদের জীবন-বিক্রয়ের মূল্য পেতে হলে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। কখনও তোমরা হত্যা করবে, আবার কখনও তোমাদেরকে তারা হত্যা করবে।

জীবন দেয়ার ক্ষেত্র ও সময়

দুনিয়ার নিয়ম হল, খরিদদার যখন টাকা দোকানীর হাতে তুলে দেয়, তখন বিলম্ব না করে খরিদদারের হাতে মাল তুলে দিতে হয়। কিন্তু আল্লাহর নিয়ম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আজ তুমি তোমার জীবন আল্লাহর হাতে জিহাদের উদ্দেশ্যে সোপর্দ কর, এখন থেকে জীবন দানকারী হয়ে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার জীবন গ্রহণ করবেন। আশি বা নব্বই বছর বয়সে হলেও সরাসরি জিহাদের ময়দানে তা গ্রহণ করতে পারেন, জিহাদের ময়দানে যাবার পথেও গ্রহণ করতে পারেন, শত্রু হত্যা করার বদলায় অথবা আপন পক্ষের কারও ভুল নিশানার শিকার হয়েও। অসর্তকভাবে নিজেদের তরবারীর আঘাতে নিহত হলেও অথবা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেয়ে নিহত হলেও, জিহাদের ময়দানে বা চলার পথে সাপ–বিচ্ছু বা জীব-জন্তুর আঘাত ও আক্রমণের শিকার হলেও অথবা পাহারাদারী করার সময় প্রচণ্ড গরম বা চরম শীতের প্রকোপে মরে গেলেও ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

মুনাফিকের অপপ্রচার

জনৈক সাহাবী খায়বরের যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। তার তরবারীখানা ছিল একটু খাট। তিনি দুশমনের শরীর লক্ষ্য করে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তরবারীখানা উঁচিয়ে পেছন থেকে নিয়ে সামনের দিকে সজোরে কশে মেরে দেন, কিন্তু তার এক পা ছিলো সামনে অপর পা ছিল পেছনে। যে কারণে তরবারী দুশমনের পায়ে না লেগে প্রচণ্ডভাবে তার পায়ে এসে আঘাত করে। তিনি নিজের তরবারী সামলাতে পারলেন না। মারাত্মক আহত হলেন। অতঃপর শাহাদাত বরণ করলেন।

তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কারণ, মুনাফিকরা বলাবলি করছিল, লোকটি তো নিজের আঘাতেই নিহত হল; শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য তার হল কই!

সদিচ্ছাবশতঃ না হলেও অগত্যা বহু মুনাফিক এসব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকত এবং এই ধরনের বিষয়-আসয় লুফে নিয়ে সমাজে মজাদার করে ছড়িয়ে দিত। মুসলমানদের সামান্যতম দুর্বলতাটিও তারা হাতছাড়া করত না। তাদের কাজই ছিল মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়ান, মিথ্যা ঘটনা রটিয়ে মুহাজির-আনসারদের মাঝে দ্বন্দের সূত্রপাত ঘটান। অমূলক

অপবাদ ছড়িয়ে সাহাবীদের অমলিন চরিত্রে মলিনতার কালিমা লেপন করা। মুসলমানদের মাঝে কূটকৌশলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সিসাঢালা ঐক্য নষ্ট করতে সর্বক্ষণ তারা তৎপর থাকত। সেই সময় থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত মুনাফিক চক্র মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে সচেষ্ট রয়েছে। যে কারণে দু'একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া মুসলিম উম্মাহ্ কখনও এক প্লাটফরমে একতাবদ্ধ হতে পারেনি, পারছে না।

যাক, তিনি অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট আসলেন। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলেন, আমার চাচাজানের ভাগ্যে শাহাদাত নসীব হয়েছে কিনা।

জবাবে প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, সাধারণ শহীদকে আল্লাহ্পাক যে পরিমাণ সওয়াব দান করেন, তোমার চাচা তার চেয়ে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়েছেন ঃ

এক. শাহাদাতের সওয়াব।
দুই. লোকদের সমালোচনার সওয়াব।

আল্লাহ যেভাবে জীবন নিয়ে খুশী হন

আল্লাহ্ কার জীবন কিভাবে এবং কাকে কার তরবারী দ্বারা গ্রহণ করবেন, তা তিনিই জানেন। এ ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অকার্যকর। মানুষের কাজ হল ভীরুতার নেকাব ছিড়ে ফেলে গাফিলীর নিদ্রা ত্যাগ করে আল্লাহ্ উপর ভরসা রেখে তাঁরই হাতে জীবন সপে দিয়ে জিহাদী তৎপরতায় ঝাপিয়ে পড়া। এই সমর্পিত জীবন আল্লাহ্ কিভাবে গ্রহণ করবেন, তা তাঁরই এখতিয়ার।

তিনি জিহাদের ময়দানে কোন কোন সাহাবীর জীবন গ্রহণ করেছেন তাঁদের শরীর বহু অংশে খন্ডিত করে। কেউ শহীদ হয়েছেন ঘোড়ার ধারাল খুড়ে দলিত-মথিত হয়ে। কেউ শহীদ হয়েছেন পাহারাদারীর সময় অজানা তীরে বিদ্ধ হয়ে। নাক, কান, হাত, পা কর্তিত অবস্থায় কারও জীবন তিনি গ্রহণ করেছেন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে অনেকে শাহাদাত বরণ করেছেন। কেউ তো আল্লাহর হাতে জীবন উৎসর্গ করেছেন জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পথে। স্বাভাবিক মৃত্যুই তাদের হয়েছিল এবং তাদের শেষ অসিয়ত ছিল, তাদের লাশ যেন মুজাহিদ কাফেলা ময়দান পর্যন্ত বয়ে নিয়ে

যায়। অন্ততঃ তাদের লাশ যেন শত্রুর মুখোমুখি ময়দানে উপস্থিত করা হয়। তারা মরেও মুজাহিদ কাফেলা ত্যাগ করতে চায়নি। জীবন্ত মুজাহিদ সাথীদের সাথে তাদের মৃতদের লাশও চলেছে জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলার লক্ষ্যে। আমরা আমাদের জীবন আল্লাহর নিকট সমর্পণ করব, জীবন তিনি কিভাবে কোন্ অবস্থায় গ্রহণ করবেন, তা একান্তই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার।

আমরা তো এতটুকু করতে ও বলতে পারি, হে আল্লাহ! আমার জীবন তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। তুমি গ্রহণ করে নাও। অতঃপর সে যদি আমীরের আদেশে রান্না-বান্নার আঞ্জাম করতে যেয়ে চুলার আগুনে দগ্ধ হয়ে বা স্টোভ বিস্ফোরিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবুও তাকে-উঁচু মর্যাদার শহীদ বলতে হবে।

শত্রু-পরিখায় প্রবেশ করে কাফির হত্যার পর নিজেকেও যদি জীবন দিতে হয়, ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থে নিজের অস্ত্রেও যদি নিজেকে জীবন দিতে হয়, তখন তাঁকে উঁচু মর্যাদার ত্যাগী শহীদই বলতে হবে।

আমাদের কাজ আল্লাহর সমীপে জীবন সোপর্দ করা। এই জীবন কিভাবে তিনি গ্রহণ করবেন, সে এখতিয়ার একান্তভাবেই তাঁর।

লোকের অমূলক সমালোচনা ও শহীদের মর্যাদা

ঐ সাহাবীর দ্বিগুণ মর্যাদা ও সওয়াব পাওয়ার একটি কারণ শহীদ হওয়া। দ্বিতীয় কারণ ছিল, কিছু লোকের তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে সমালোচনা করা এবং একে অমূলকভাবে বিতর্কিত রূপ দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

যারা মুজাহিদ ও শহীদদের মর্যাদাহানিকর সমালোচনা, তিরস্কার ও টিপ্পনি কাটে, উপরোক্ত ঘটনা তাদের জন্য মহা হুঁশিয়ারী বটে। এটাও সত্য কথা, তাদের সমালোচনা দ্বারা মুজাহিদদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, উপকারই হচ্ছে।

জান্নাত কখন পাবে?

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, তবে জীবনের বিনিময়ে উপহৃত জান্নাত তারা পাবে কবে?

এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, অবশ্যই জান্নাত পাবে, তবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পূর্বশর্ত তো পূরণ হতে হেব। এই সকল পূর্বশর্ত বর্তমান কুরআনসহ তাওরাত ও ইঞ্জিলেও উল্লেখিত হয়েছে। এ কথাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالقُرْآنِ

'তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিচল।'

আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার কেবল কুরআনেই নয় বরং রহিত হওয়া পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত ইঞ্জিলেও উল্লেখিত হয়েছিল যে, যে আমার পথে জীবন দিবে, আমি তাকে তার জীবনের বিনিময়ে অবশ্যই জান্নাত দান করব। এ অঙ্গীকারের স্বার্থকতা সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতাংশেই বলা হয়েছে ঃ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ

"সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে।"

উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে পুরুষের উদ্দেশে যত জায়গায় বায়'আতের কথা উল্লেখিত হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদের বায়'আতের কথা বলা হয়েছে। কেননা বায়'আত করে পুরুষ লোকেরা। আর তারা জিহাদ ছাড়া কিসের জন্য বায়'আত করবে। কোন এক কবি বলেছেন ঃ

خلق الله للحروب رجالا

ورجالا بقصعة وثريد

"আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের জন্য কিছু পুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং কিছু পুরুষ মানুষ রয়েছে, যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আহার গ্রহণ ও বিলাসিতায় ডুবে থাকার জন্য।"

আল্লাহ তায়ালা পুরুষ-মুমিনকে নির্বাচিত করেছেন ইসলামদ্রোহীদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করে ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই সকল মুমিনকে আল্লাহর পথে যুদ্ধে লড়তে হবে। কেননা তিনি তো এ জন্যই মুমিনের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।

জিহাদের বায়'আত ও কুরআনের বিবরণ

পবিত্র কুরআনের তিন জায়গায় বায়'আতের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তা স্পষ্টই জিহাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

প্রথম ঃ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

"সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে।" (তাওবা ঃ ১১১)।

এ ক্ষেত্রে বায়'আত লেনদেন ও অঙ্গীকার উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" (ফাত্‌হ ঃ ১০)

তৃতীয় ঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল।" (ফাত্‌হ ঃ ১৮)

এ ক্ষেত্রেও বায়'আত দ্বারা জিহাদের বায়'আত বুঝান হয়েছে। আর সাহাবীগণও সর্বক্ষেত্রে বায়'আত দ্বারা জিহাদের বায়'আতই বুঝতেন ও বুঝিয়েছেন ঃ

نَحْنُ الذينَ بايَعُوا مُحَمَّدا

علي الجِهادِ مابَقِينا ابدا

"আমরা তারা, যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে শপথ গ্রহণ করেছি যে, যতদিন বেঁচে থাকি জিহাদ করব, জিহাদ ত্যাগ করব না মরণ না আসা পর্যন্ত।"

হাদীসের আলোকে জিহাদের বায়'আত

নিম্নে উল্লিখিত হাদীসটিকে সহীহ সনদে ইমাম মুসলিম, মুসনাদে কুবরা ও বায়হাকীসহ ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুজাশি

ইবনে মাসউদ সালামী (রাঃ) বলেন ঃ

اَتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم انا واخى فقلنا بايعنا على الهجرةِ فقال مَضتِ الهجرةُ لاهلها فقلتُ علام تُبايعنا ؟ قال على الاسلامِ والجهادِ

"আমি আমার ভাইয়ের সাথে হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলাম। আমি তাকে বিনয়ের সাথে বললাম, আমাদেরকে হিজরাতের উপর বায়'আত করুন। প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, যারা হিজরাত করেছে তাদের হিজরাত করে চলে যাওয়ার সাথে সাথে হিজরাতের প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে।"

অতঃপর আমি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলাম, তবে এখন আমরা কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করব?

তিনি বললেন, "ইসলাম ও জিহাদের উপর।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির শুরুর দিকে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করা হত। পরবর্তী সময়ে বায়'আত গ্রহণ করা হয় কেবল জিহাদের উপর।

দ্বিতীয় আর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

হযরত ইয়ালা ইবনে মাম্বাহ (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের পরের দিন প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে গেলাম এবং তাঁকে বিনয়ের সাথে বলল-াম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার আব্বাকে হিজরাতের উপর বায়'আত করুন। প্রিয়নবী (সা) বললেন, হিজরাতের উপর নয় বরং তাকে জিহাদের বায়'আত করাব। কেননা মক্কা বিজয়ের পর হিজরাতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে।"(সুনানে কুবরা বায়হাকী ঃ পৃ ঃ ১৬, খ ঃ ৯)।

বায়'আতে মুসলমানদের সাথে উত্তম ব্যবহারের শর্ত

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বায়'আত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, "তোমরা ঈমান গ্রহণ কর এবং

وَاَنْ تُنَاصِحَ الْمُؤْمِنِيْنَ

" ঈমানদারদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার কর।"

হৃদ্যতার অর্থ কখনও এই নয় যে, পৃথিবীর কোন জনপদে কোন মুসলিম নিগৃহীত হবে, নিহত হবে; আর আমরা সুখভোগ ও আয়েশ করে বেড়াব–

ঈমানদারের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে আর আমরা তাদের পুড়ে যাওয়া ঘরের ভষ্ম ও ধোয়া চেয়ে চেয়ে দেখব–

কোন ঈমানদারকে বেঈমানরা বন্দী ও আহত করবে, আর আমরা তাদেরকে অনুযোগের সুরে নসীহত করব, আহা লোকটা ধরা খেতে গেল কেন?

তাই সকল মুমিনকে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করার সময় এ বাক্যটিও উচ্চারণ করতে হবে ঃ

تناصح المؤمنين

'পারস্পরিক কল্যাণ কামনা ও নিরাপত্তার সুদৃঢ় অঙ্গীকারও করতে হবে।'

ইসলামী পরিভাষায় 'নসীহাত' বলা হয়, সকল কাজে পরস্পরে কল্যাণ কামনা করা।

সে কথাই হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخو المسلمِ لا يَظلمُهٗ ولا يُسلمه

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না নিজে সে অপর মুসলমানের উপর জুলুম করবে, না তাকে কাফেরদের নিকট ছেড়ে আসবে।"

সাহাবী হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বায়'আত গ্রহণ করার সময় প্রিয়নবীকে (সাঃ) বললেন ঃ

اِشْتَرِطْ عَلَيَّ يا رَسُولَ اللهِ

"হে আল্লাহর নবী! আমার বায়'আতে বিশেষ কোন শর্ত সংযুক্ত করে দিন।"

অতপর প্রিয়নবী (সাঃ) তার বায়'আত গ্রহণে এ বিষয়টি যুক্ত করেছেন–

وتناصح المؤمنين

"ঈমানদারের সাথে পরস্পরে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করবে।"

অসৌজন্যমূলক, আপত্তিকর, নির্দয় ও কঠোর কোন ব্যবহার পরস্পরে করবে না। কোন মুসলমান দুঃখ পেলে তোমার হৃদয়ও ব্যথিত হবে, কোথাও কোন মুসলমান অত্যাচারের শিকার হলে তোমার মন কাঁদবে– তার কষ্টে তুমিও ছটফট করবে।

কোন মুসলমানের 'বাঁচাও' চীৎকার শুনলে অবশ্যই তুমি তাকে উদ্ধার করতে ছুটে যাবে। অপর ভাইয়ের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বাজি রাখবে। চীৎকারের শব্দ শুনে তার দ্রুত চলার বাহন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার কান সজাগ হয়ে যাবে, সে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকবে এবং নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, " সে মুসলমানের জীবন সবচেয়ে উন্নত, যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের বেলায় গভীর খেয়াল রাখে, যখনি কোন চীৎকারের শব্দ শুনে, কোন ভয়ার্ত আওয়াজ শুনে, তখনই ঘোড়া দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

وَالموتُ مَطانةُ

'তখন তার মন বলে, এ সাহসী তৎপরতার সময় (মুমিনের কল্যাণে) যেন আমার মৃত্যু হয় এবং আমি যেন প্রকৃত মালিকের সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করি।'

কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

প্রিয়নবী (সাঃ) সাহাবীর বায়'আত গ্রহণে দ্বিতীয় যে বাক্যটি সংযুক্ত করেছিলেন, তাহলো ঃ

وَاَنْ تُفارِقَ الْمُشرِكِيْنَ

"মুশরিকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে।"

মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের কোন প্রকারের সম্পর্ক থাকবে না। তাদের সাথে সাজুয্য-সামঞ্জস্যও থাকবে না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং তাদের ভোজ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাতে হবে সার্বিবভাবে। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَقاتِلوا الْمُشرِكِيْنَ كَآفَةً كما يُقاتِلُونَكُمْ كَآفَةً

"মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে।" (তাওবা ঃ ৩৬)।

জীবন ও সম্পদের কুরবানী ছাড়া জান্নাত কিভাবে লাভ হবে?

সাহাবী হযরত বাশীর ইবনে মা'বাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসেছিলাম ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে। প্রিয়নবী (সাঃ) শর্ত আরোপ করেন যে, "আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, নামায কায়িম করতে হবে, যাকাত ও হজ্ব আদায় করতে হবে, রমযান মাসের রোযা পালন করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে হবে।"

শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর ভিতর থেকে দু'টি শর্ত পালন করার আদৌ ক্ষমতা রাখি না, একটি হল জিহাদ। কারণ আমি শুনেছি, পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا
فِئَةً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

'সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহর বিরাগ-ভাজন হবে।' (আনফাল ঃ ১৬)

কেননা সে শত্রুকে কেবল পিঠ দেখাল না বরং সে ইসলামেরও দুর্নাম করল। তখন স্বাভাবিকভাবে লোকে মনে করবে, কাফির শক্তির ভয়ে ভীরু মুসলিম পালিয়ে যাচ্ছে। ফলে লোক ঈমান ত্যাগ করে কাফিরদের সঙ্গে যোগ দিবে। এইরূপ ঘটনা দেখার পর দুর্বল-চিত্তের মুসলমানেরও ঈমান দোদুল্যমানতার শিকার হবে, তারা ভবিষ্যতে চরম শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে অস্থির হবে।

এরপর সাহাবী বললেন, হে আল্লার রাসূল! এইসব শংকা ও ভীরুতার কারণে আমি জিহাদ করতে আদৌ সক্ষম নই। আমার ভয় হয়, যুদ্ধে যোগদান করলে আমি ভয়ে পালিয়ে যাব। ফলে অবধারিতভাবে আমার উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশম্পাত। জিহাদ করার সামান্য সাহস আমার নেই।

দ্বিতীয়তঃ আমি যাকাত আদায়ে সমর্থ নই। উল্লেখযোগ্য কোন সম্পদই আমার নেই। মাত্র কয়েকটি ছাগল আছে। এর আয় দিয়ে আমি কোন রকম সংসার চালিয়ে যাচ্ছি।

সাহাবী বলেন, আমি এ কথা বলার পন প্রিয়নবী (সাঃ) আমার হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দেন এবং বলেন ঃ

لا صَدَقَةَ ولا جِهادَ فبِما تَدْخُلُ الجَنَّةَ

'সাদকা দিবে না, জিহাদ করবে না, সম্পদ ব্যয় করবে না, জীবনও দিবে না, তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিসের বিনিময়ে?'

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মুখ থেকে এরূপ তীর্যক কথা শুনার পর তাঁর মনের সকল দুর্বলতা দূর হয়ে সে বলিয়ান হয়ে উঠে সুদৃঢ় অঙ্গীকার উচ্চারণে-

فبايعتُ علي ذالك كلِّه

'অতঃপর প্রতিটি বিষয়ে আমি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম।' (মুসনাদে কুবরা বায়হাকী পৃঃ ২০, খঃ ৯। তাফসীর ইবনে কাছীর পৃঃ ৯৩, খঃ ২)

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সময়ে আবশ্যিকরূপে নিয়মিত জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করা হত।

সে কারণে রাসূল (সাঃ) ঐ সাহাবীর ওযর ও দুর্বলতা গ্রহণ করেননি।

তাঁর দুর্বলতার পিছনে যুক্তিও ছিল। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁর দুর্বলতা ও যুক্তি প্রত্যাখান করেছেন। দুঃখের বিষয়, বহু মুসলমান এই একই যুক্তি দেখিয়ে হরদম বলে যাচ্ছে যে, তাদের ঈমান নাকি জিহাদ করার মত মযবুত এখন হয়নি। এই শ্রেণীর লোকদেরকে উপরোক্ত সহীহ হাদীসটি গভীর মনোনিবেশের সাথে বারবার পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। আশা করি বিষয়টি সকলেরই বুঝে আসবে। না হয় জান্নাতে যাবে কিভাবে?

দুর্বলতা প্রকাশ করে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অপচেষ্টা

অনেকের মুখে শোনা যায়, তারা বলে থাকে, দুশমনের গোলাবারুদ ও ট্যাংকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিহাদ করার মত শক্ত ঈমান এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের সেই সামরিক শক্তি কোথায়, যদ্বারা আমরা শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-বিমান ঘায়েল করে মাটিতে ফেলে দিব! তারা বলে, সামান্য শক্তি নিয়ে বিশাল শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা তো আজকাল চিন্তাই করা যায় না। যদি যুদ্ধ

করতেই হয়-প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্রের। অথবা আসমানী ফেরেশতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং প্রয়োজন আশি বছর বয়সের পাকা ঈমান। কাঁচা ঈমান নিয়ে যুদ্ধে নেমে জীবন বিসর্জন দিয়ে লাভ কি? জিহাদের জন্য চাই দ্বীনদার মেহনতী মযবুত ঈমানওয়ালা লোক।

এই কথা যারা বলেন, তারা দয়া করে জানাবেন কি, কি করে আপনাদের ঈমান মযবূত ও টেকসই হবে আশি বছর বয়সে?

সুযোগ সন্ধানী ঐ লোকগুলোর বয়স আশি বছরে দাঁড়ালে তখন অবশ্যই এই আয়াতখানা পড়ে শুনাবে ঃ

لَيْسَ عَلَى الاَعْمٰى حَرَجٌ وَلا عَلي الاَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلي المَرِيْضِ حَرَجٌ

এখন তো পায়ে বল নেই, চোখে দেখি খুবই কম, শরীর ভীষণ দুর্বল। অর্থাৎ-এখন পা থাকতেও খোড়া, চোখ থাকতেও অন্ধ আর শারীরিক অসুস্থতার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। যে যে কারণে জিহাদে যাওয়া ফরয হয় না, তা সবই এখন বর্তমান। অতএব আমাদের উপর জিহাদ এখন ফরয নয়।

হে আমার সুযোগসন্ধানী দুর্বলমতি ভায়েরা! ইচ্ছামত এভাবে কথা বললে রেহাই পাওয়া যাবে না। যে আল্লাহ সকল মুসলিমকে ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি ঈমান মযবুত করার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

"হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা কাফিরদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হও (অবশ্য তোমার শত্রুপক্ষ হাতি নিয়ে যুদ্ধ করছে, তাদের ট্যাংক ও অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে, তাদের রয়েছে ধারাল বল্লম ও লক্ষ্যভেদী তীর-ধনুক) তখন তুমি দৃঢ়পদ থেকে তাদের মোকাবেলায় লড়ে যাও।"

হে আল্লাহ! চতুর্দিক থেকে গোলাবারুদ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সামনে থেকে দৈত্যাকারের বিশাল ট্যাংক ধেয়ে আসছে, মাথার উপর থেকে যুদ্ধ-বিমান বোমা নিক্ষেপ করছে, বোমার বিস্ফোরণে পৃথিবী অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, এমন ভয়াবহ কঠিন অবস্থায় যুদ্ধের মাঠে কিভাবে দৃঢ়পদ থাকব!

তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

"তখন আমাকে বেশী পরিমাণে স্মরণ কর।"

তবেই তোমার নযরে শত্রুর সাজসাজ রব, মারমার তৎপরতা খেলনা মনে হবে। গোলাবারুদ, তোপ, বোমা মামুলী আর কি! ওর ভয়ংকর ক্ষতিকারিতা তোমার দৃষ্টিতে হালকা পরিগণিত হবে। তীব্রগতি বিমানগুলো দেখতে তোমার ভালই লাগ্‌বে। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পোড়া যমীনে তুমি আনন্দমুখর নতুন বসতি দেখতে পাবে। তুমি তখন জীবনের সার্থকতা অনুভব করতে পারবে। কেবল তখনই সে যুদ্ধ তোমাকে দান করবে কল্পনাতীত সুখ, অফুরন্তু শান্তি ও মৃত্যুহীন জীবন। জান্নাতে সবার উপরে থাকবে তোমার আসন।

একদিকে জীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্গিন মুহূর্তে হৃদয়ের গভীর আকুতির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে। ওদিকে তোমার সাহায্যে আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করছে। তারা শত্রুর তোপ অকার্যকরী করে দিবে অথবা তোপের গতি পাল্টে দিয়ে ভুল নিশানায় নিক্ষেপ করবে। তখন যদি তোমাকে বরণ করার জন্য হুর এসে উপস্থিত হয়, তবে গুলিটি তোমার বুক ভেদ করে সৌভাগ্যের রাজটিকা তোমাকেই উপহার দিবে। তুমি হয়ে গেলে জান্নাতের বর, জান্নাতের অনিবার্য অংশীদার।

তবে এ স্বাদ ও মধুর মৃত্যুতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে না। এই মৃত্যুর স্বাদ ও আনন্দের কথা তুমি জান্নাতে যেয়েও ভুলতে পাবে না। সেখানে যেয়ে তুমি আল্লাহকে অনুরোধ করে বলবে, ইয়া আল্লাহ! ঐ মৃত্যু তুমি আমাকে আবার দান কর।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে কেবল যুদ্ধ করতে বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি যুদ্ধের নিয়ম এবং কলা -কৌশলও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি শক্ত পায়ে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করতে চাও, তবে আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার ও বায়'আতের উপর অটল থাক এবং শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। তবেই তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে কত বিপুল আয়োজনে আল্লাহর সাহায্য তোমার সাথী হচ্ছে। আল্লাহ তোমার কত নিকটে, তখনই তুমি তা একান্তভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। তুমি তাঁকে অতি কাছেই

পাবে। শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সময় একমাত্র তিনিই তোমার অভিভাবক, সাহায্যকারী ও মদদগার।

আল্লাহর শক্তি স্বচক্ষে অবলোকন

এক লোক জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে 'ইসমে আ'যম' শিখিয়ে দেয়ার জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি করছিল। লোকটির ধারণা ছিল, 'ইসমে আ'যম' কোন অজ্ঞাত ও আশ্চর্য বিষয় হবে। শেষে বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে বললেন, 'আল্লাহ' হল ইসমে আযম।

বুযুর্গ ব্যক্তির কথা লোকটির আদৌ বিশ্বাস হল না।

সে তাকে বলল, আপনি কেমন বুযুর্গ 'ইসমে আযম' জানেন না!

বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে বললেন, আমার কথা বুঝতে হলে বাস্তব অভিজ্ঞতার দরকার আছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন যেদিন হবে সেদিনই কেবল আমার কথার যথার্থ সত্যতা বুঝতে পারবে।

একদিন ঐ লোকটি নৌকায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। নদীর মাঝখানে হঠাৎ ঝড় শুরু হল। গভীর পানিতে নৌকা ডুবে গেল। সাঁতার না জানার ফলে লোকটি ডুবে যাচ্ছিল। এ জন্যই অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট বিদগ্ধজন বলেছেন, পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার আগে সাঁতার শিখে নেয়া দরকার।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর লিখিত একখানা পত্রে আমি দেখেছি, তিনি লিখেছেন ঃ

عَلِّمُوا اَوْلَادَكُمْ السِّبَاحَةَ

"নিজ সন্তানদেরকে তোমরা সাঁতার শিখাও।"

তিনি আরও লিখেছেন, 'সন্তানদেরকে প্রথমে সাঁতার শিখাও তারপর ইলম শিখাও।'

কারও কোন বিষয় অজানা থাকলে অন্যের নিকট থেকে জেনে নেয়া যায়। কিন্তু পানিতে ডুবে গেলে মাছ কাউকে বলে দেবে না, কিভাবে সাঁতার কাটতে হয়। তখন কী উপায় হয়?

ঐ লোকটি এখন নাকানি-চুবানি খেয়ে গভীর পানিতে ডুবে যেতে থাকলে তার মনে পড়ল সেই বুযুর্গের কথা। তিনি বলেছিলেন 'আল্লাহ' হল ইসমে আযম। লোকটির এ বিশ্বাস ছিল, ইসমে আযমের বরকতে কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এবার সে হৃদয়ের গভীর আকুতিসহ

'আল্লাহ' বলে তাঁর নিকট নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধারের অনুরোধ জানাল। পর মুহূর্ত থেকে সে সাঁতরিয়ে কূলের দিকে উঠে এল এবং স্বীকার করল, বুযুর্গের কথা সত্য, আসলেই 'আল্লাহ' ইসমে আযম। এ কথা সম্পূর্ণরূপে তখন উপলব্ধি হয়েছে যখন কোন মাধ্যম ও সাহায্য ছাড়া একমাত্র তাকেই মালিকরূপে বিশ্বাস করেছে।

মানুষ তো আল্লাহর উপর ভরসাও করে, আবার পকেটের দিকেও তাকিয়ে দেখে। আল্লাহর উপর ভরসা করে পথ চলা শুরু করে গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস আছে, তবুও জাগতিক স্বার্থে হন্নে হয়ে ঘুরে মরে।

আমরা বিশ্বাস করি, যদি হৃদয়ে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ করার আকুতি জাগে, যদি তার সাহায্য স্বচক্ষে দেখার সাধ হয়, আল্লাহ নামের মিষ্টি স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা যদি জাগ্রত হয়, তবে নির্দ্বিধায় জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হও।

দেখতে পাবে, নির্ঘাত গুলীর নিশানা থেকে মুজাহিদরা কিভাবে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। ঈমানের মযবুতী দেখতে হলে জিহাদের ময়দানে ছুটে এস। দেখ মুজাহিদদেরকে আল্লাহ দান করেন কত দৃঢ় ও মযবুত ঈমান। কিভাবে তার কুদরাতের সাহায্যে ট্যাংকের ভয়াবহ বিস্ফোরণ থেকে তারা রক্ষা পায়, যুদ্ধ-বিমানের বোমার আঘাতে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তারা কিভাবে অক্ষত বেঁচে যায়।

যদি সাহাবীওয়ালা ঈমানের এক ক্ষুদ্রাংশ অর্জন করার সাধ হয়-

যদি সাহাবা জীবনের অনুসরণ করতে ইচ্ছে হয়-

যদি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র নিঃসীম শক্তি উপলব্ধি করার আগ্রহ জাগ্রত হয়-

যদি আল্লাহর শক্তি অবলোকন করার আকাংখা হয়-

যদি চিরঞ্জীব ও সদাবর্তমান আল্লাহর চিরঞ্জীবত্ব উপলব্ধি করার আগ্রহ থাকে-

যদি আল্লাহর কাহহারিয়াত ও জাব্বারিয়াত এর ভয়াবহ চিত্র চক্ষে দেখার তামান্না হয়-

তবে জিহাদের ময়দানে এগিয়ে এস, সেখানে আল্লাহ তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন, তিনিই পরাক্রমশালী এবং তার শক্তিই সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী।

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ

"বহু ক্ষুদ্র দল বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।" (বাকারা ঃ আয়াতাংশ ৪৯)

-আমিই বিশালাকার ট্যাংকের গতি ঘুরিয়ে দেই, আমিই যুদ্ধ বিমানের বোমা অকার্যকর করে থাকি, আমিই বারুদের আঘাত থেকে তোমাদের রক্ষা করি।

যখন তোমরা ময়দানে উপস্থিত হবে এবং এই অভাবিতপূর্ব অত্যাশ্চর্য দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবে, তোমাদের ঈমান অত্যন্ত মযবুত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে।

এই হলো জিহাদের বায়'আতের বিস্তারিত বিবরণ ও তার ফলাফল। এ ছাড়াও এ বিষয়ের উপর বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আমি এ আলোচনা দ্বারা কখনও এ কথা বলতে চাচ্ছি না যে, ইসলাহী বায়'আত নিষিদ্ধ বা তা করা যাবে না। আমি নিজেও একজন বুযুর্গের হাতে বায়'আত করেছি। আমি আমার সাথী-বন্ধুদেরকে ইসলাহী বায়'আত গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকি যে, তারা যেন বুযুর্গদের সাথে ইসলাহী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। এর দ্বারা বহু আত্মিক রোগের চিকিৎসা ও নিরাময় লাভ হয়ে থাকে। ইসলাহী বায়'আতের এই উপকারিতা ও বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না।

এখন যেহেতু জিহাদের বায়'আতের কথা আলোচনা হচ্ছে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে ইসলাহী বায়'আতের আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না এবং তা উচিতও হবে না। কেননা বর্তমান সময়ে এই বিষয়ের আলোচনাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং এটাই সময়ের দাবী।

এ হল সেই বায়'আত, যে বায়'আত রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে গ্রহণ করা হত আর আকাশ থেকে ফেরেশতা এসে বায়'আত গ্রহণকারীদের বেহেশত-এর সনদ বিতরণ করত।

সাহাবীগণ বলেছেন, প্রিয়নবী (সাঃ) (হুদায়বিয়ায়) বৃক্ষের নীচে বসে যখন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলা নেয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে মৃত্যু ও জিহাদ থেকে পিঠ-টান দিয়ে পেছনে ফিরে না থাকার বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আজ আল্লাহর যমীনে তোমাদের থেকে উত্তম কোন লোক নেই এবং আকাশেও কেউ নেই তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উঁচু মর্যাদার দাবীদার।'

মুজাহিদের মর্যাদা

এই মর্যাদা এ জন্য যে, তারা আপন জীবন আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। একেই বলে মুসলিম জীবনের মেরাজ, এটাই আল্লাহর দাসত্বের শ্রেষ্ঠ স্তর। আমার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস জীবন ও সম্পদ সাহসের সাথে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে? পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে ঃ

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلٰي الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً

"আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।" (নিসা ঃ আয়াত ঃ ৯৫)

বিজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন, আয়াতে উল্লেখিত القاعدين শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীকে বুঝান হয়নি। এর দ্বারা প্রত্যেক যুগের তাদের সকলকে বলা হয়েছে, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে ঘরে বসে রয়েছে, জিহাদী জীবন অবলম্বন না করে জিহাদকে উপেক্ষা করছে। জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতায় অবহেলা ও উন্নাসিকতা দেখিয়েছে। এরা সকলে এই উপবিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।

কিছু লোক আছে, যারা রাত-দিন সমানে ইবাদত করতে থাকে, ফাযায়েল–ফযিলাত পালনে দারুণ আগ্রহ দেখায়, হাবভাবে বুযুর্গী প্রকাশ করে। এদের চেয়ে সেই ব্যক্তি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র, যিনি ফাযায়েল ফযিলাত পালনের সময় বেশী পান না বটে, তবে তিনি জিহাদী জেন্দেগী গ্রহণ করেছেন এবং ময়দানে ইসলামের শত্রুর মোকাবেলায় বুকটান করে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। এ কথা পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। বিশ্বাস করি, এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার দুঃসাহস কেউ দেখাবেন না অবশ্যই।

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের কবিতার কথা মনে পড়েছে। সে সময়ে মক্কাসহ সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ফোযাইল ইবনে ইয়াযকে তিনি জিহাদের ময়দান থেকে এই পংক্তি কয়টি লিখে পাঠিয়েছিলেন। ফোযাইল ইবনে ইয়ায প্রতি রাতে অন্তত সত্তরবার পবিত্র কাবা তাওয়াফ করতেন। তিনি অনন্য বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। বাদশাহ হারুন রশীদ তার সাক্ষাতে এলেও তিনি তার ঘরের দরোজা খুলতেন না এ কারণে যে, ইবাদাতে তার একনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাবে।

একদা রণাঙ্গনে যুদ্ধকালীন সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের নিকট কোন এক ব্যক্তি এই বুযুর্গের কথা উল্লেখ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের কথা কে না জানেন। তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ। তার মত বিদগ্ধ হাদীস বিশারদ পৃথিবী দ্বিতীয়জন উপহার দিতে আজও ব্যর্থ রয়েছে।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক 'তরসুস' রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছিলেন। প্রচণ্ড শীতের মওসুম। হাঁড় কাঁপানো শীতের মধ্যে তিনি একহাতে তরবারী নিয়ে তাঁবু পাহারা দিচ্ছেন।

এই সময়ে তাকে কেউ বলে 'আপনি উত্তম কাজ করেছেন', কিন্তু মক্কায় ফুযায়েলকে কি বলব বলুন! কাবা নিয়েই সে ব্যস্ত রয়েছে, চোখ ভরে কাবা দেখে, রাত-দিন তাওয়াফ করে এবং ওখানেই থাকে। কেবল হেরেমের মাটির উপরই হাঁটে, যে মাটিতে হেঁটেছেন প্রত্যেক নবী-রাসূল।

আমার এক ওস্তাদ বলেছিলেন, মক্কার হেরেমে আর কিছু লাভ না হোক অন্তত এতটুকু সৌভাগ্য অর্জন হয় যে, নবী-রাসূলগণ যেখানে পা রেখেছেন, আমার পা সেখানের ধুলা-মাটি স্পর্শ করে ধন্য হল। হয়তো এ কারণেও আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

এমন পবিত্রতম পুণ্য ভূমিতে ফোযায়েল ইবনে ইয়ায রাত-দিন ইবাদত করছেন।

যাক, ঐ লোকের কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক তৎক্ষণাৎ ফোযায়েল ইবনে ইয়াযকে উদ্দেশ করে এই পংক্তি কয়টি লিখেন ঃ

يا عابدَ الحَرَمين لو أبصرتَنا
لعَلِمتَ انك بالعبادةِ تَلعبُ

-পবিত্র হেরেমে ধ্যানে-মগ্ন হে সাধক! তুমি যদি এখানে এসে আমাদের ইবাদত দেখতে, তবে আমাদের ইবাদতের তুলনায় তোমার ইবাদতকে তুমি খেলনা মনে করতে।

এবার শুন, তোমার ও আমাদের ইবাদতের মাঝে পার্থক্য কতটুকু ঃ

من كان يَخضبُ خَدَّهُ بدُموعِه
فَنُحورُنا بِدمائِنا تَتَخَضَّبُ

-যখন তোমার ইবাদতে জোশ ও জযবা আসে, তখন তোমার আখি

বেয়ে অশ্রু ঝরে, কপোল সিক্ত হয়। আর আমাদের যখন জযবা আসে তখন গ্রীবার রাঙ্গা রক্তে বুক সিক্ত হয়। তোমার আখিবাহিত অশ্রুও পবিত্র। তবে তার রং সাদা। আর আমরা যে প্রবাহে সিক্ত হই তার রং লাল। তোমার আখি-অশ্রুর ধারা ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে থাকে এবং জীবন ভর ঝরে। কিন্তু আমাদের বাহিত রক্ত অদম্য এবং অজস্র ধারায় একবার ঝরে। সে রক্ত সিক্ত করে প্রতিটি বনী আদমকে। এখানেই একটি জীবনের সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকে তারা আলিঙ্গন করে অকুণ্ঠচিত্তে।

رِيحُ العَبِير لكم ونحنُ عَبِيرُنا
رَهْجُ السنابِكِ والغُبارُ الاطيبُ

তুমিও খোশবু-আতর ব্যবহার কর। আমরাও খোশবু-আতর ব্যবহার করি। তুমি মেশক আম্বরে সুরভিত হয়ে তাওয়াফ কর, আমরাও সুরভিত খোশবু ব্যবহার করি, তবে তা মেশক আম্বর নয়, তা যুদ্ধ ময়দানের ধূলোবালু, যা আমাদের অবয়ব ও পরিধেয় কাপড়ে লেপ্টে থাকে। মনে রাখবে, তোমার খোশবুর মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনায় জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়নি। যদিও খোশবু ভালো জিনিস। কিন্তু আমাদের এই অবয়ব ও কাপড় মলিন করা ধূলো-বালু সম্পর্কে প্রিয়নবী স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

لا يَجتَمِعُ غبارٌ فى سَبيلِ اللهِ وَدُخانُ جَهنمَ

"জিহাদের ময়দানে ধূলো মলিন অবয়ব আর জাহান্নাম কখনও একত্রিত হবে না। জাহান্নামের ধুয়াও এ মুখো হবে না।" (তিরমিযী, পৃঃ ২৯২, খঃ ১)

প্রিয়নবী (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ

ما اغبرَّتْ قَدَما عَبْدٍ فى سَبيلِ الله فَتَمَسَّهُ النارُ

"যে ব্যক্তির দু'পা খোদার রাহে ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়েছে, তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করতে পারে না।" (বুখারী, পৃঃ ৩৯৫, খঃ ১)

জিহাদের ময়দান থেকে যে নাকে ধূলো যাবে, ধূলোমলিন যে পায়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবে, সে পা ও নাক এবং জাহান্নাম একাকার হবে না এক মুহূর্তের জন্যও, কল্পনায়ও নয়। এর দ্বারা বুঝে নাও তোমার খোশবু ও আমার খোশবুর মাঝে ব্যবধান কতটুকু।

اَوكان يَتْعَبُ خَيْلُهٗ فى باطل
فَخُيولُنا يومَ الكَريهةِ تَتْعبُ

তোমার ঘোড়া দিনমান অনর্থক কাজে ক্লান্ত হয়,

আমাদের ঘোড়া ভয়াবহ যুদ্ধ লড়ে তবে ক্লান্ত হয়।

তুমি সকালে ঘর থেকে বের হও এ আশা নিয়ে যে, বিকেলে ফিরে আসবে।

আর প্রতি কদমে আমাদের দূরন্ত আকাঙ্খা থাকে,

এখনই বুঝি শাহাদাতের মধু-পেয়ালা নসীব হবে।

আমরা প্রতিক্ষণ প্রভূর দিদারের আশায় উন্মুখ থাকি, আর তোমরা বিচ্ছেদের আশা পোষণ করে দিন যাপন কর। মিলন ও বিচ্ছেদের অর্থ কি কখনও এক হতে পারে? কখনই নয়।

একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে তোমাকে এবং আমাকেও। আখেরাতে পুরস্কৃত হওয়ার কী নিশ্চয়তা নিয়ে যাচ্ছ তুমি, একবার ভেবে দেখবে কি?।

মৃত্যুর পর তোমাকে গোসল দেয়া হবে, তোমার বিদায়ে কত লোক শোকাবিভূত হবে, জানাযা হবে, কবরে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। হয়ত তোমার জন্য তা কোন জটিল বিষয় নাও হতে পারে।

পক্ষান্তরে আমাদের ব্যাপার তোমার থেকে ভিন্নতর। মুজাহিদের শাহাদাত লাভে কেউ কাঁদে না, শোকাভিভূত হয় না, বরং সকলে আনন্দ প্রকাশ করে, ফুল দিয়ে তাকে মুবারকবাদ জানায়। গোসলের দরকার হয় না। শহীদের পবিত্র খুন কেন ধুয়ে ফেলবে?

তোমাদের পরনের কাপড় খুলে ফেলা হয়। আর শহীদের কাপড় শরীরেই থাকে। কবরে তাকে ফেরেশতা প্রশ্ন করতে উদ্যোগী হলে তাকে বলা হবে, কি প্রশ্ন করছ একে, এর রক্তাক্ত শরীরই তো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

তোমাদের জানাযায় হয়ত অসংখ্য লোক হবে, সকলে তোমার মাগফিরাত প্রার্থনা করবে। আমাদের জানাযা তো বহু লোক এ ভয়ে পড়বে না যে, কিভাবে জীবন্ত লোকের জানাযা পড়ব! আল্লাহ তায়ালা তো এদেরকে জীবিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, জীবিত মানুষের আবার জানাযা!

সাহসী কিছু লোক জানাযা পড়বে বটে, তবে আমাদের মাগফিরাতের জন্য নয়। বরং আমাদের মাগফিরাত প্রার্থনার উসীলা ধরে নিজের পাপ

মাফ করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। তোমার ও আমার জীবন-মৃত্যুর এই হল ব্যবধান।

ولقد اتانا من مقالِ نبيّنا قولُ صادقٍ لا يَكذِبُ

প্রিয় নবীর অমর বাণী বেজেছে মোদের কানে,

সত্য যাহা সঠিক যাহা কে আছে মিথ্যা বলে?

هذا كتابُ الله يَنطِقُ بَينَنا

ليس الشهيدُ بِميت لا يَكذِبُ

আল্লাহর এই কিতাব তোমার আমার মাঝে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে বলছে শহীদ কখনও মৃত্যুবরণ করে না। সে চির জীবন্ত। তবে মৃত্যুর পরে তোমাকে লাশ ও মৃত বলা হবে। পক্ষান্তরে শহীদকে মৃত বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। সে চির জীবন্ত, অমর। কত প্রসন্ন শহীদের ভাগ্য। বিষয়টা একবার ভেবে দেখবে।

প্রিয়নবীর (সাঃ) উম্মত শ্রেষ্ঠ কেন?

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হবে, তা জিহাদের বায়আত সংশ্লিষ্ট। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ উম্মত বানালেন কেন?

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلناس تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের আদেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।" (আলে ইমরান ঃ ১১০)

বিজ্ঞ আলিমগণ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, বহু কথা তারা বলেছেন ঃ

তাদের তাফসীরসমূহ গভীরভাবে অবলোকন করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ঈমান গ্রহণ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বারণ করার দায়িত্ব পূর্ববর্তী উম্মতগণও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন। যদি তা-ই হয়, তবে বর্তমান উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল কিরূপে?

হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানুবী (রাহঃ) তাঁর এক গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈলকে (আঃ) কোন এক জনপদ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! সে জনপদে আপনার এমন এক বান্দা রয়েছে, যে জীবনে এক দণ্ডও আপনার অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করেনি। (এমন নিষ্পাপ বুযুর্গ লোক থাকতে কিভাবে সে জনপদ আমি ধ্বংস করে দিব!) আল্লাহ তায়ালা বললেন, হ্যাঁ, সে জনপদ ধ্বংস কর, ঐ লোককেও ধ্বংস করে ফেল। কারণ সে শুনত ও দেখত-তার সামনেই অপরাধ-অন্যায় সংঘটিত হত, কিন্তু লোকটি এর প্রতিরোধ তো করতই না, বরং এভাবে আল্লাহর নাফরমানী দেখে সে সামান্য ব্যথিতও হত না, কোন কষ্ট অস্বস্তিভাবও ফুটে উঠত না তার অবয়বে। তাই তাকেও ধ্বংস করে দাও।" (তাসহীলুল মাওয়ায়েয, পৃঃ ১১১, খঃ ১)

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' বিষয়ক নির্দেশ অবশ্য পালনীয় ছিল।

এভাবে বনী ইসরাঈলের এক গোত্রের জন্য সপ্তাহে একদিন মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সপ্তাহের ঐ নিষিদ্ধ দিনে বিপুল পরিমাণ মাছ পানির উপর ভাসত, হাতের নাগালের মধ্যে এসে মাছ সাঁতার কাটত। নদীর মাছ সব কুলে উঠে আসতে চায় যেন, মাছ শিকারের এমনই এক লোভনীয় অবস্থা ঐদিন সৃষ্টি হত। কিন্তু যেসব দিনে মাছ শিকারে কোন বাধা-নিষেধ নেই, সেসব দিনে মাছের এমন তৎপরতা আদৌ লক্ষ্য করা যেত না।

কিছু লোক নিষিদ্ধ দিনে মাছ শিকারের এই লোভ সামলাতে পারল না। তারা এ হারামকে হালাল প্রতিপন্ন করার জন্য এক কৌশল গ্রহণ করল। তারা নিষিদ্ধ দিনে নদীর কূল ঘেঁষে কূপ খুঁড়ে তার সাথে নদীর পানির সংযোগ নালা তৈরী করে রেখে দেয়, যাতে রোববার এসব কূপে মাছ এসে জমা হয় এবং তারা সোমবার তা শিকার করতে পারে।

এ তৎপরতা শুরু হওয়ার পর ঐ কওমের লোকেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ

★ একদল এভাবে মাছ শিকার করতে থাকে।

★ দ্বিতীয় দল ওদেরকে এই হারাম থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করে।

★ তৃতীয় দল সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে।

পরবর্তী সময় যখন ঐ কওমের উপর তাদের অপরাধের জন্য আযাব আপতিত হয়, তখন দু'দল আযাবের শিকার হয় ঃ

★ এক. যারা এই অপরাধ ঘটিয়েছে।

★ দুই. যারা অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেও নীরব ভূমিকা পালন করেছে।

উপরোক্ত দল দু'টির সকল লোকের চেহারা আল্লাহ তায়ালা বানর ও শূকরের চেহারায় রূপান্তরিত করে দেন। এই আযাবে নিপতিত হওয়ার তিন দিন পর তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (অনেকে মনে করে, বর্তমান মানব ও শূকর প্রজাতি গযবে পতিত বনী ইসরাইলের ঐ লোকদেরই বংশধর- এ ধারণা ঠিক নয়)।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের' হুকুম কার্যকর ছিল। তাহলে বর্তমান উম্মত কিভাবে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল?

ইমাম কাফফাল শাশী (রাহঃ) এর যথার্থ জবাব দিয়েছেন, যা ঈমাম রাযী (রাহঃ) তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরুল কবীর' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। মূল্যবান ব্যাখ্যাটি স্বর্ণ দিয়ে লিখে রাখলেও তার যথার্থ সম্মান ও মূল্যায়ন হয় না বুঝি। তিনি বলেছেন ঃ

"এক. 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এর নিম্নস্তর হল মন ও মুখ দিয়ে বারণ করা।

দ্বিতীয়. সর্বোচ্চ স্তর হল, কিতাল বা যুদ্ধের মাধ্যমে সকল অন্যায় ও অপরাধ সমূলে বিদূরীত করা।

অতএব অন্য উম্মতের চেয়ে এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হল, 'আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের' সর্বোচ্চ স্তর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পালন করা। অর্থাৎ এ উম্মত বাতিলের মুকাবিলায় যুদ্ধ করে, তাই তারা অন্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

ইমাম রাযী তাঁর এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে তাফসীর শাস্ত্রের জনক ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

"তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। আর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তা স্বীকার ও পালন কর এবং যে তা পালন করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" (তাফসীরুল কাবীর, পৃঃ ১৮০, খঃ ৮)

পাকিস্তানের মুফতী আজম মাওলানা শাফী (রাহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ্ মা'আরিফুল কুরআনের মধ্যেও এই অভিমতকে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যবলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতগণকেও 'আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের' আদেশ দেয়া হয়েছিল; কিন্তু তাদের কথা কেউ শুনত কেউ উপেক্ষা করত। অন্যায়কারীদের প্রতিহত করার মত কঠিন দায়িত্ব পালন থেকে তারা বঞ্চিত ছিল।

তাই এ উম্মত তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হল, তারা 'আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করবে এবং যারা আল্লাহর হুকুম পালন করবে না তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অর্থাৎ বর্তমান উম্মত দাওয়াতের সাথে সাথে জিহাদের দায়িত্বও পালন করবে। তাই তারা সকল উম্মতের চেয়ে সেরা উম্মত। (মা'আরিফুল কুরআন, উর্দু, পৃঃ ৩০, খঃ ২)

পূর্ববর্তী উম্মতের দাওয়াত ব্যর্থ ও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকত; কিন্তু এ উম্মতের দাওয়াত সফল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত নেই। কেননা, তাদের দাওয়াতের বাহন হল জিহাদ। অতএব এদের দাওয়াতী কর্মসূচী ও অগ্রযাত্রা কে আছে মধ্য পথে রুখে দেবে? তাই এই উম্মত সবার চেয়ে সেরা উম্মত।

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্যের কাজ হলো ঈমান গ্রহণ এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ হল কুফরী করা।

মানুষকে ঈমানদাররূপে গড়ে তোলা এবং এর সাথে সাথে কুফরী থেকে বিরত রাখা হল 'আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের' যথার্থ প্রতিপালন, যা পালন করার জন্য জিহাদ অপরিহার্য।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রাহঃ) লিখেছেন, পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে, যারা কুফরী বিশ্বাসে অত্যন্ত দৃঢ়। এদেরকে

তরবারীর আঘাত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় মুসলমান বানানোর উপায় নেই।

উল্লেখ্য যে, এ কথা স্পষ্ট বুঝা গেল, এ উম্মতের উত্তম উম্মত হওয়ার একমাত্র কারণ জিহাদ ও যুদ্ধে অবহীর্ণ হওয়া। উপরন্তু মুসলিম জীবনের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ হল যুদ্ধ করা। সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি ও রেযামন্দির সনদ দিয়েছেন জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য জীবন-মরণ বায়'আত গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে; সে কথা কে না জানে?

কিন্তু আজ এই বায়'আতের ধারাবাহিকতা আমাদের জীবন থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জিহাদের বায়'আতের ধারা কিভাবে বন্ধ হল

নকশে দাওয়াম নামক গ্রন্থে মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মিরী তাঁর পিতার জীবনালোচনায় লিখেছেন, সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসকরা যখন প্রতিবাদ, আন্দোলন ও জিহাদ নিষিদ্ধ করে দেয়, তখন সকল মাদ্রাসা ও খানকায় অতি গোপনে মুসলমানদের নিকট থেকে জিহাদের বায়'আত গ্রহণের প্রথা চালু হয়ে যায়। এভাবে সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদও জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করতেন।

জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করা জরুরী কেন, এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা এবং এ গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা কেন বন্ধ হল, তা এক বিস্মৃত বিষয়। এখানে এ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করছি-

হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রাহঃ) জেলে বন্দী হওয়ার সময় দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষকের পদে সমাসীন ছিলেন। অতি গোপনে তার ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন-তৎপরতা অব্যাহত ছিল। তাদের বাস্তবমুখী প্রথম তৎপরতা ছিল 'রেশমী রুমাল' নামক আন্দোলন, যা ছিল একান্ত গোপনীয় ও কমান্ডো তৎপরতার মত। তখন তার এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল কর্মীকে তিনি কাবুল পাঠিয়েছেন, অন্য একজনকে পাঠিয়েছেন মস্কো। বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন ও সহযোগিতার আশায় বহু দেশ ও এলাকায় তিনি তার দক্ষ কর্মী বাহিনীকে নিয়োগ করেন। বৃটিশ সরকারের কেন্দ্রীয় শক্তিকে বিক্ষিপ্তকরণের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ নিজস্ব শক্তিকে একক কেন্দ্রে একীভূত করাও এ কৌশলের আওতাভুক্ত ছিল।

আন্দোলনের সাথে জড়িত প্রত্যেক কর্মীর নিকট থেকে নিয়মানুযায়ী আবশ্যিকরূপে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করা হত। কিন্তু কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এ আন্দোলন অংকুরেই ব্যর্থ ও বিনাশ হয়ে যায়।

এক সময় হযরত শায়খুল হিন্দু মাওলানা মাহমুদুল হাসানের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যান্য শিক্ষকদের নীতিগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, "এ মাদ্রাসাকে দ্বীন রক্ষার জন্য তৈরী করেছি, তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার তৎপরতায় এ মাদ্রাসার যদি ক্ষতি হয়, তবে তা নৈতিকভাবে আমরা মেনে নিতে বাধ্য রয়েছি। দ্বীন রক্ষার আন্দোলনে দ্বীনী মাদ্রাসার সাময়িক ক্ষতি হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক।"

কিন্তু মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকদের অভিমত ছিল, "কোন অবস্থায় মাদ্রাসার কোন ক্ষতি হতে দেয়া যাবে না। মাদ্রাসার সামান্য ক্ষতির আচড় না লাগিয়ে যতটুকু আন্দোলন করা সম্ভব ততটুকু করতে হবে, এর বেশী নয়।"

শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বললেন ঃ

"আমাদের সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় ইসলাম। মৌলিক দু'টি বিষয়ের উপর আমরা এ মাদ্রাসার ভিত্তি রেখেছি। এক. ইলমে দ্বীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক স্বাভাবিক ও প্রকাশ্য কাজ-কর্ম সম্পাদন। দুই. জিহাদ-বাতিলের মোকাবেলায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। অতএব কোন অবস্থায় আমাদের জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য বিসর্জন দেয়া উচিত নয়।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শত চেষ্টা করেও অন্যদেরকে বুঝাতে ব্যর্থ হলেন। তারা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করল না।

শাইখুল হিন্দু (রাহঃ)-এর চিন্তার সাথে দ্বিমত পোষণকারী কতক ব্যক্তি দেওবন্দ মাদ্রাসার আত্মা রেখে খোলস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাওয়ার ফলে জিহাদী মিশন ও তৎপরতা উপমহাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

দ্বিতীয় কারণ প্রসঙ্গে যে কথাটি বলব, তা শুনে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ভুল না ভুঝলে খুশী হব। কেননা আলীগড়ের স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান এ ক্ষেত্রে মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত। স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানকে ইংরেজ বণিকরা মুসলমানদের হিতকামী হিসেবে সমাজে

পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল; কিন্তু তিনি ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিলেন। তার লিখিত বই-পুস্তক পড়লে এ কথার সত্যতা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় হল, তোমরা ইংরেজ হয়ে যাও, অতপর ইংরেজকে তাড়াও।"

কয়েকদিন আগে একখানা বই পড়েছিলাম। তাতে অনেকগুলো মজার গল্প ছিল। তার একটি গল্প বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। যদিও গল্প, তবে জুৎসই বটে। গল্পটি হলো-

একটি বানর জঙ্গল থেকে শহরে এসে সবকিছু দেখে জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলের স্বগোত্রীয় বানদেরকে সে বলল, মানুষ কত উন্নতি করেছে; তারা বিমানে আকাশে উড়ে, চমৎকার গাড়ীতে দ্রুত চলে, এরা কত উন্নত, মনে হয় উন্নতির চরম পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে। আর তোমরা সেই বানরই রয়ে গেছ, এখনও গাছে গাছে ঝুলছ, হেঁটে হেঁটে চলছ, গাছের ডালে ও বাড়ীর চিলেকোঠায় এখনও তোমরা রাত যাপন কর। কত নীচু তোমাদের জীবনযাত্রা। একটি গাড়ী, একটি বাড়ি এ পর্যন্ত তোমরা তৈরী করতে পারলে না! সবাই মিলে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আমাদের এই পশ্চাৎপদতার মূল কারণ কি? কেন আমরা বনের বানর বনেই রয়ে গেলাম। কেন আমাদের কোন উন্নতি হল না?

চিন্তা-ভাবনা করে কেউ বলল, আসলে মানুষের লেজ নেই, আমাদের রয়েছে একটি বাড়তি লেজ, এই লেজই আমাদের অনুন্নতির একমাত্র কারণ। এই লেজটা কেটে ফেল, দেখবে অতি দ্রুত তোমরা উন্নতির শীর্ষ সোপানে পৌঁছে গেছ।

এ কথা শুনে এক যুবক-বানর লেজ কেটে ফেলতে উদ্যোগী হয়। লেজের ঝামেলা থেকে সে এখনই মুক্তি পেতে চায়।

বৃদ্ধ বয়সী বহু বানর তাকে বুঝাল, লেজসহ তোমাকে ভাল মানায়, মানুষের লেজ নেই সে জন্য তোমার লেজ কেটে ফেলতে হবে এটা কোনো যুক্তির কথা নয়। যদিও তুমি লেজ কেটে ফেল তবুও কিন্তু তুমি মানুষ হতে পারবে না কোনোদিন। যে বানর সেই বানরই থেকে যাবে। পরে লেজের জন্য আফসোস করবে।

বুড়া বানরদের কথা সে শুনতে আদৌ রাজী নয়। লেজটা কেটেই তবে সে শান্ত হল।

লেজকাটা এ আধুনিক বানরটি দেখে যুবতী এক বানরী তো মস্ত দেওয়ানা। লেজওয়ালা স্বামী থেকে তালাক এনে লেজকাটা আধুনিক বানরের সাথে বিবাহ না বসা পর্যন্ত তার ঘুম হল না। তা-ই করল।

স্যার সাইয়্যেদ আহমাদও আমাদেরকে বানরের বুদ্ধি শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা ইসলামের লেজ কেটে ফেল, দেখবে ইংরেজ হয়ে গেছ। অথচ ইংরেজদের নৈতিক চরিত্র কত জঘন্য। সমকামিতার মত জঘন্য পাপের ফলে সে দেশের লাখ লাখ মানুষ মরণ-ব্যাধি এইডসের শিকার। কুকুর-শূকরের চেয়ে নীচু তাদের যৌন জীবনাচরণ।

আমাদের উন্নতিও কি নিহিত রয়েছে তাদের মত চরিত্রহীন হয়ে এইডসের জীবাণু শরীরে বহন করার মধ্যে? অতএব তাদের শিক্ষা ও চরিত্র গ্রহণ করার পরে কোন্ নৈতিকতা বলে এদেশ থেকে তাদেরকে আমরা তাড়াব? বরং আমরা যখন তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করব তখন তাদের তাড়ান তো দূরের কথা আমরা আর তারা এক চিন্তা ও সভ্যতায় লীন হয়ে একাকার হয়ে যাব। আসলে স্যার সৈয়দ আহমদের অনুসারীদের শেষ পরিণাম তা-ই হয়েছিল।

ইংরেজদের ফ্যাশন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করার পরে তাদেরই একজন হয়ে কিভাবে আমি তাদের আগ্রাসন থেকে মুক্তির চিন্তা করব? বরং আমি তাদের চরম সমর্থক ও তল্পিবাহক হব এটাই সত্য।

এটাই পৃথিবীর নিয়ম, যারা যখন বিজয়ী থাকে, সাধারণ মানুষ তাদেরই আচরণ-অভ্যাস গ্রহণ করে। মানসিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আমাদের উপরে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত। যে জন্য দুর্বলমতি লোকেরা তাদের অনুসরণ করার মধ্যেই উন্নতি নিহিত রয়েছে বলে ভাবছে। আসলে এই চিন্তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। কেননা বানর কখনও মানুষ হতে পারে না এবং মুসলমানও কখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করে উন্নতি করতে পারবে না। পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার মধ্যে লুকায়িত রয়েছে আমাদের মর্যাদা লাভ ও উন্নতি সাধনের সকল উপকরণ।

আজ যদি মুসলিম জাতি বিজয়ী বেশে বিশ্ব শক্তির আসন দখল করে নেয়, দেখবে কাল থেকে মানবজাতি মুসলিম সভ্যতার অনুসরণ করা শুরু করে দিয়েছে; এটাই নিয়ম।

আরবে যখন মুসলিম শক্তি বিজয়ী ছিল তখন কাফিররা মুসলিম পোশাক পরিধান করে গর্ববোধ করত এবং বলত, মুসলমানের মত আমরাও সভ্য মানুষ।

সে কথাই বলছি, স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্রদেরকে এ কথাই শিখিয়েছিলেন, তোমরা ইংরেজ সভ্যতা গ্রহণ কর, দেখবে উন্নতির শীর্ষ সোপানে তোমরা পৌঁছে গেছ। অথচ ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে পিটিয়ে তাড়াতে হবে, ইসলামের এই শত্রুদের সাথে যে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ছিল, সে কথা তিনি একবারও তাঁর ভক্ত-অনুসারীদেরকে বলেননি। বরং মুসলিম মানস থেকে জিহাদকে ভুলিয়ে দেয়াই ছিল তাদের অন্যতম মিশন। তাদের সেই ভ্রান্তি ও ভুলের মাশুল দিচ্ছি আমরা আজ অবধি। আশা করি, এই যথার্থ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না কেউ। যদি কারও দ্বিমত থাকে, তাকে প্রথমে বলতে হবে, তবে উন্নতির বদলে আমরা অবনতির দিকে যাচ্ছি কেন দিন দিন?

একটি জীবনের সম্মানে চৌদ্দশত প্রাণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধের প্রশ্নে চৌদ্দশত প্রাণ জীবন-মরণ অঙ্গীকারে সুদৃঢ় ছিল। তারা হযরত ওসমানের মৃত্যুর বদলা অবশ্যই নেবে। এদের ভেতর প্রিয়নবীও (সাঃ) ছিলেন, যার জীবন সকলের চেয়ে মূল্যবান। হযরত আবুবকর সিদ্দিকও (রাঃ) ছিলেন তাদের একজন, নবীদের পরে মানুষের মধ্যে যার স্থান সবার উপরে। হযরত ওমরও (রাঃ) ছিলেন তাদের একজন, যিনি নবী ছিলেন না বটে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে কুরআনের বহু বিষয় সম্পর্কে আগাম ধারণা দান করেছিলেন। হযরত আলীও (রাঃ) ছিলেন তাদের একজন, যাকে শিশু বয়স থেকে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আল্লাহ তায়ালা মনোনীত করেছিলেন। এদের সঙ্গে ছিলেন হযরত সা'আদ ইবনে মা'আয আনসারীর (রাঃ) মত মহান পুণ্যাত্মা সাহাবী, যার জানাযা নিয়ে চলার পথে প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছিলেন, এর জানাযায় এত বেশী ফেরেশতা জমায়েত হয়েছে যে, ভয় হচ্ছে আমার পা তাদের পালক না মাড়ায়। যে কারণে তিনি পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে পরখ করে জানাযা নিয়ে সামনে এগুচ্ছিলেন।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, "তার (সাদ ইবনে মা'আয আনসারীর) রূহ নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশে গেলে আরশে খুশীর ধুম ওঠে।" কেননা তিনি মারাত্মক আহত অবস্থায় বনু কুরায়যার সাথে জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যে

কারণে প্রিয়নবী (সাঃ) তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। গাযওয়া আহযাবে তিনি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন এবং সে কারণেই তাঁর শাহাদাত ঘটে।

এদের মধ্যে বিখ্যাত ক্বারী হযরত উবাই ইবনে কা'বও ছিলেন। গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মত সাহাবীও তাঁদের সাথে ছিলেন। এ ধরনের চৌদ্দশত বিখ্যাত সাহাবী জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন মাত্র একটি মানুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।

তারা বিবেকের তাড়নায় ছটফট করছিলেন এ কারণে যে, বেঁচে থেকে লাভ কি। মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থকতাই বা কি, যদি না মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। যদি না মুসলিম জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারি। আজ যদি আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হই, তবে কোন্ মুখে কাফিরদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাব? তারা তখন বলবে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তোমরা তাদের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছিলে? যে ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, সে ইসলাম গ্রহণ করব অপরের দাস হয়ে বাঁচার জন্য? তাই ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতি সকলের আস্থা অর্জন ও মুসলিম জীবনের নিরাপত্তার জন্যও ওসমান হত্যার প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে।

সাহাবীগণ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বময় ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে নিজের জীবন পেশ করেছেন। তাঁরা জীবনের বিনিময়ে সকল ফেৎনা নির্মূল করেছেন এ জন্য যে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামের নির্মল ছায়ায় নিরাপদে স্বমর্যাদায় বেঁচে থাকতে পারে। এভাবে জীবন দিয়ে সকল পাপাচারের মুকাবিলায় জিহাদ করে এ পর্যন্ত তারা অবিকৃতরূপে ইসলাম পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য কো্ন ইসলাম রেখে যাচ্ছি? এ ইসলাম কি আসলে ইসলাম?

আমরা তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই ইসলাম রেখে যাচ্ছি, যে ইসলামকে আমরা বৈরাগ্যের পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছি-

- যে ইসলামের অপর নাম হল ভোগ-বিলাস ও আনন্দ আরাম।

যে ইসলামের অপর নাম হল আত্মমর্যাদাবোধ ও অনুভূতিশূন্য ইসলাম।

- যে ইসলামের জন্য জীবন দেয়ার কল্পনা করাই দুষ্কর।

- যে ইসলাম মানুষকে পার্থিব চিন্তায় বুঁদ করে রাখে। দুনিয়াদারদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলে, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার চিন্তা তার মনে আদৌ উদিত হয় না।

- সব ব্যাপারে তার মনে আগ্রহ আছে একমাত্র জিহাদ ব্যতীত।

-সবকিছুতে তার উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়, শুধু শাহাদাত লাভের আকাঙ্খা তার মনে কখনও জাগ্রত হয় না।

-আত্মার রিপুগুলো দমন ও হত্যা করার ইচ্ছে হয়। অনেকে দমন করেই ছাড়ে বা দমন করার চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহর শত্রুদেরকে নির্মূল ও দমন করার জয্‌বা ও প্রয়োজনীয়তা সে আদৌ অনুভব করে না।

আজ অযুত মুসলমানকে কাফিররা নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। এ হত্যার প্রতিশোধ নেয়া কি জরুরী নয়? এ ক্ষেত্রে কি জিহাদ ফরয নয়? কোটি মুসলমানকে হত্যা করা হলেও কি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবেদন কেউ জানাবে না? তখনও কি জিহাদ ফরয হবে না? অথচ এক মুসলমান অপর মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেও তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু আজ কাফিরদের ভাগ্য বড় দরাজ। হাজার মুসলিমকে হত্যা করলেও তাদের শরীরে কাঁটার আঁচড় পর্যন্ত লাগছে না। তারা কি মুসলিম হত্যার জঘন্য অপরাধে দোষী নয়? আজ কাফিরের খুন মহামূল্যবান, সস্তা শুধু মুসলিমের খুন। কাফিরের মাথার মূল্য আজ আকাশ ছোঁয়া, মুসলমানের মাথা হলো ফুটবল। যার কাছে যায় সেই পদাঘাত করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। কাফিরদের সম্মান হিমালয় সমান। চরম অসম্মানিত হলো মুসলিম সমাজ। বিশ্ব দরবারে অমর্যাদাকর এক জাতি হল মুসলিম উম্মাহ।

একবার ভেবে দেখুন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কোন্ ইসলাম আমরা রেখে যাচ্ছি?

আজ মুসলমানকে জিহাদের আবেদন জানানো হলে সে বলে, কুরআনে জিহাদের কোন আলোচনাই নেই। তাদেরকে বর্তমান গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে মর্যাদার আসনে উত্তরণের লক্ষ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বললে বনী ইসরাইলের মত তারা বলে, আল্লাহর দ্বীন আল্লাহই রক্ষা করবেন। এ নিয়ে তোমার আমার ভাববার দরকার নেই।

এমন ঈমান দ্বারা কি উপকার হবে?

তবে কি তোমরা আগামী প্রজন্মকে এ কথাই বলে যাচ্ছ যে, আমাদের ঈমান বড়ই দুর্বল তাই জিহাদে অবতীর্ণ হতে পারছি না? জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যে পরিমাণ ঈমান দরকার আমাদের বুকে সে ঈমান নেই। খোদার পথে জীবন দেয়ার মত ঈমানী জয্‌বাও আমাদের নেই। কেউ প্রকাশ্যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলেও সামান্য দুঃখবোধ জাগ্রত হয় না আমাদের হৃদয়ে। কাউকে পবিত্র কুরআন জ্বালিয়ে দিতে দেখলেও তার প্রতিবাদ জানানোর শক্তিটুকু খুঁজে পাই না। এই যদি হয় ঈমানের অবস্থা, তবে তা দিয়ে হবে কি? এই ঈমানকে কি ঈমান বলা যায়? মৃত এই ঈমান দিয়ে কি উপকার হবে নিজের ও মুসলিম উম্মাহর?

ঈমান তো তাকে বলে, যে আল্লাহর কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এবং শরীরের রক্তটুকু তাঁরই পথে নজরানা দেবে, যে আল্লাহর কালেমা পড়েছে তাঁর বিধান ও মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জীবন দান করবে। সে বিধানের সবটুকু তার বুঝে আসুক বা না আসুক। তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবনপাত করতে হবে। তাকেই তো ঈমান বলে।

শক্তির পরিমাপ

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন কোন কাজ করার হুকুম দেননি, যা সম্পাদন করতে আমরা অপারগ। অতএব এমন তো হতে পারে না যে, আমাদেরকে তিনি জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন; অথচ আমরা জিহাদ পালনে অক্ষম থাকব! অতএব বুঝতে হবে, তিনি যখন জিহাদ পালন বাধ্যতামূলক করেছেন, তখন জিহাদ করার শক্তিও মানুষকে দান করেছেন। যদি জিহাদ পালনের শক্তি, সাহস, সামর্থ মানুষের না থাকত, তবে অবশ্যই এই অক্ষম মানুষের উপর জিহাদ পালনের মত গৌরবময় দায়িত্ব তিনি চাপাতেন না। আল্লাহ কারও উপর জুলুম করেন না। জিহাদ পালনের এই শক্তি ও সাহস আমার আছে কি নেই, তা ঘরে বসে আন্দাজ করা যাবে না। জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বুঝতে পারব, সেই শক্তি আমাদের কাছে কি নেই।

প্রত্যেক বিষয়ের আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে। কোন কাজের জন্য যখন পর্যন্ত কেউ উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সফলতার মুখ দেখতে পায় না। তাই সাঁতার শিখতে হবে পানিতে। পানিতেই হতে হবে সাঁতার প্রতিযোগিতা। অনুরূপ আল্লাহর নিকট আপন জীবন সোপর্দ

করে শাহাদাত বরণের শক্তি তখনই উপলব্ধি করবে যখন নিষ্কম্প পদে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কেবল তখনই সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে ঈমানের প্রচণ্ড শক্তি। ঈমানের এই প্রজ্বলন ক্ষমতা ঘরে বসে উপলব্ধি করা যাবে না।

জিহাদ থেকে বিরত থাকার যন্ত্রণা

জিহাদে যোগদান করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অপরাগতা বশতঃ ঘরে বসে থাকা মুজাহিদ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। প্রিয়নবী (সাঃ) তাদের উদ্দেশে বলেছেন ঃ

وَتَوَلَّوا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُوْنَ

"আমার কাছে এমন কোন বাহন নেই যে, তার উপর তাদের সওয়ার করাব, যখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না, যা জিহাদে ব্যয় ও ব্যবহার করবে।" (সূরা তাওবা ঃ ৯২ আয়াতাংশ)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِنَّ بِالمَدِيْنَة رجالاً ما قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلا سِرْتُمْ مَسِيْرًا اِلاَّ كانُوا مَعَكمْ

জিহাদে যোগদান করতে না পারার যন্ত্রণায় এরা সকলে ফিরে যাচ্ছে। প্রিয়নবীও (সাঃ) কাঁদছেন এদেরকে সাথী করতে না পারার দুঃখে। কাফেলা সামনে এগিয়ে চলেছে। তখন সাহাবীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন ঃ

'জিহাদের উদ্দেশ্যে যখন তোমরা কোন জনপদ অতিক্রম কর, কোথাও অবতরণ কর, পাহাড়ী পথ বেয়ে সামনে চল, ইবাদাতে মশগুল হয়ে পড়, আবার সামনে অগ্রসর হতে থাক, এতে তোমরা যে সওয়াবের ভাগী হও; ঐ কেঁদে কেঁদে বাড়ী ফিরে যাওয়া সাথীরাও তোমাদের সমান সওয়াবের অংশীদার হবে। কেননা তারা জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।'

জিহাদে যোগদান করতে না পারার যন্ত্রণায় আজ তো কেউ কাঁদছে না– ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতার জন্য জিহাদে যোগদান করতে না

পারার দুঃখে কোন মুসলিমকে আজ কাঁদতে দেখছি না। কেন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হচ্ছে না?

আসলে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে পেরে আমরা দারুণ আনন্দিত। না হয় কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট এই ফরিয়াদ করা উচিত ছিল, হে আল্লাহ! হযরত হানযালা (রাঃ)-এর মত শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য আমাদের দান কর। আমিও কি অর্জন করতে পারি না হযরত হামজার মত তোমার সন্তুষ্টি? বরং উল্টো আনন্দ করে বলা হচ্ছে, জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত এখানে অনুপস্থিত। তাই আমরা নীরব আছি।

জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ এখানে অনুপস্থিত বলে জিহাদের ক্ষেত্র সৃষ্টি না করে কিভাবে তারা আয়েশী সুরে বলছে, জিহাদের সুযোগ এখানে অনুপস্থিত! জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয আমল বন্ধ থাকার জন্য তাদের মনে সামান্য দুঃখবোধ হচ্ছে না কেন? কেন তারা জিহাদ করতে না পারার ব্যথায় যন্ত্রণাকাতর হচ্ছে না? জিহাদের হাদীস পড়া ও পড়ানোর সময় অফুরন্ত সওয়াব ও সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন শাহাদাত বরণের আকাঙ্খা কেন আমাদের মনে জাগ্রত হয় না? প্রতিদিন যে শত শত মুসলিম অমুসলিমের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিচ্ছে, সে জন্য এতটুকু দুঃখবোধ হয় না আমাদের হৃদয়ে? চিন্তাগ্রস্ত হই না এ কথা ভেবে যে, মুসলমানদের সম্মান ও স্বাধীনতা সুরক্ষায় কেন পরাস্ত হচ্ছি আমরা? কেন হারাল মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠ বিশ্ব শক্তির আসন, সে কথা একবারও গভীরভাবে ভেবেছি কি?

প্রতিদিন যতটি মুগরী যবেহ হচ্ছে না, তার চেয়ে বেশী জীবন দিচ্ছে মুসলিম সন্তান। কেন আজ বিশ্ব দরবারে একটি মুরগীর মর্যাদাও নেই মুসলিমের। যদিও আজ জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার সকল উপকরণ ও শর্ত সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে, নেই কেবল জিহাদ করার মানসিকতা। শয়তানী প্ররোচনা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করে যদি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়, দেখবে কিভাবে আল্লাহর সাহায্যের দরোজা আমাদের জন্য অবারিত রয়েছে। আমাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র না থাকতে পারে, হৃদয়ের উত্তাপ ও রক্ত প্রবাহনের জয্‌বা তো আছে, যে রক্তধারা বাতিলকে পরাজিত করতে পারে খুবই অল্প সময়ে- এ বিশ্বাসে আমরা দুর্বল কেন?

সিরিয়ার মুসলমানদের সেই যুদ্ধের কথা আমরা পড়েছি, শুনেছি। যখন কাফিররা মুসলিম রমণীকে বন্দী করে সারিতে দাঁড় করিয়ে যৌন লালসা নিবৃত্তকরণের দৃষ্টতা দেখিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় নিজেরা বন্টন করে

নিচ্ছিল, তখন হযরত জাররার (রাঃ)-এর বীরঙ্গণা বোন হযরত খাওলা (রাঃ) সকল মহিলাকে বললেন ঃ

বোনেরা আমার! অবশ্যই দেখেছ কাফিররা তোমাদেরকে ভোগ করার উদ্দেশ্যে এই তো এখন আঙ্গুলের ইশারায় পরস্পর ভাগ-বন্টন করে নিল'। তোমরা তাদের ভোগের খোরাক হতে যাচ্ছ।

হে কুরাইশ বীর কন্যাগণ! হে আরবের মর্যাদাদীপ্ত মা ও ভগ্নীগণ!! ইসলামের জন্য যাদের জীবন উৎসর্গিত, ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে যাদের জীবন আজ ধন্য, তারা আজ এই সময়ে কেন আপন মর্যাদা রক্ষায় স্ফুলিংগের মত জ্বলে উঠছে না! কেন তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলে কাফিরের নাপাক অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে দিচ্ছে না!

এ কথা শুনে সকল মহিলা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। তারা বলল, হে খাওলা! আমরা ভীরু নই, কিন্তু লড়ব কি দিয়ে, একটি তরবারীও তো আমাদের নিকট নেই।

খাওলা (রাঃ) বললেন, তাঁবুর খুঁটিও কি নেই? আর কিছু না হলেও আপন অমলিন চরিত্র ও উঁচু মর্যাদা সুরক্ষার স্বার্থে শরীরের রক্ত তো ঝরাতে পারব। তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়।

তাদের তাঁবুর বাইরে পাহারাদার টহল দিচ্ছিল। হঠাৎ পাহারাদারের মাথায় আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার হাতের তরবারীখানা মুজাহিদ মহিলাগণ দখল করে নেন। অল্প সময়ের মধ্যে আরও কয়েকখানা তরবারী তাদের হাতে আসে। এহেন সঙ্গীন অবস্থা দেখে সৈনিকরা এদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু কেউ তাদের সামনে আসার সাহস পাচ্ছিল না। সকল মহিলা লাঠি ঘুরিয়ে কাফিরদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। মহিলাদের দমন করার জন্য তাদের চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাদের সাথে পারছে না। জীবন-মরণ লড়ে যাচ্ছেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ রমণীগণ। এমন সময় দূর থেকে 'তাকবীরের' আওয়াজ শোনা গেল। পৃথিবী তাকিয়ে দেখল, এদিকেই এগিয়ে আসছেন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আল্লাহর তরবারী খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)। আকাশ-বাতাস কাঁপানো তার 'তাকবীর' ধ্বনী শুনে কাফির সেনারা সন্ত্রস্ত হল। যুদ্ধরত রমণীগণও তাকবীর দিয়ে নবচেতনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যূহ ভেদ করে কাফিরদের উপর।

একটি কাফিরও সেদিন জীবন বাঁচিয়ে বাড়ী যেতে পারেনি। অথচ কিছুক্ষণ আগে এদের হাতেই বন্দী ছিল পরাজিত রমণীগণ। আর এখন তারাই বিজয়ী।

সেই বোনদের হাতে যে লাঠি ছিল, তাদের শরীরে যে রক্ত ছিল; তা-ও কি আমাদের নিকট নেই? তাদের মত আমরাও কি পারি না বাতিলের মোকাবেলায় লাঠি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে?

একান্তভাবে কামনা করি, কঠিন সংকটের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে আমরা যেন জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। কাশ্মির, আলজেরিয়া, তাজাকিস্তান, আরাকান ও সুদানের মুসলিমরা, হোক ফাসেক-ফাজের, তারা জিহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করছে। তাদের ভূখণ্ডে জিহাদ সংঘটনের সকল শর্ত সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান কিনা এ কথা ভাবার সুযোগ তাদের নেই। কেননা ইসলাম বিরোধী শক্তি এখন তাদের ঘরেই অবস্থান করছে। আমরাও কি তবে তাদের মত ইসলাম বিরোধী শক্তির পদতলে পিষ্ট হওয়ার সংকটপূর্ণ সময়ের অপেক্ষা করছি?

জাতি ও জীবনব্যাপী এমন মহা ঘনঘটার পূর্বে আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব ও জিহাদের বায়'আত গ্রহণের উপলব্ধি দান করুন। হে আল্লাহ! জিহাদের উপর বায়'আতের আমল পুনর্বার তুমি উজ্জীবিত কর। হে আল্লাহ! এমন ঈমাম ও নেতা আমাদেরকে দান কর, যার হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করে আমাদের শাহাদাত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ হয়। হে আল্লাহ! আমাদের জীবন, ধন-মান তোমার নিকট সোপর্দ করছি, তুমি আমাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য কবুল কর।

জিহাদ ত্যাগ করার পরিণাম

আমি বলব, বাবরী মসজিদ ধ্বংস হয়নি, বরং শাহাদাতবরণ করেছে। আর শহীদ, সে ত জীবন্ত। আমরা ভাবছিলাম, নিজেদের রক্তের উত্তাপে উম্মতকে জাগ্রত করব জিহাদের জন্য। আমরা যা পারিনি, বাবরী মসজিদ তা করল। সে নিজেকে উৎসর্গিত করে সফলতার পথে আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী এগিয়ে আছে। তার শাহাদাতের ফলে আমাদের মাঝে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি ও জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। হে বাবরী মসজিদ! এ কৃতিত্বের সবটুকুই তোমার। আমরা যা পারিনি, তুমি তা করলে; অতএব, তুমিই আমাদের রাহ্‌বার। তোমাকে আঘাতকারী জালিমেরা কোথায় লুকিয়ে আছে দেখিয়ে দাও।

এখন খতিয়ে দেখার সময় এসেছে, বাবরী মসজিদের মত হৃদয়বিদারক ঘটনা বারবার কেন সংঘটিত হচ্ছে বহু জনপদের বিভিন্ন অংশে? কেন বাবরী মসজিদ ও তার সাথীরা বারবার আঘাতের শিকার হচ্ছে? কোন্ সাহসে ইয়াহুদী গোষ্ঠী মদীনার দিকে চেয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে?

হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইয়াহুদীদের খায়বর হতে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন ইয়াহুদী গোষ্ঠী হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর পায়ে পড়ে খায়বরে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। এক বৃদ্ধ ইয়াহুদী এসে তাঁকে বলল, হে ওমর! আপনার সামনেই ত মুহাম্মদ বলেছিলেন, 'ইয়াহুদীদেরকে খায়বরে বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে। এ সুযোগদানের বদলায় তারা খাজনা স্বরূপ তাদের উৎপাদিত শস্যের একটা অংশ মুসলমানদের প্রদান করবে।' তারপরও আপনি আমাদের উচ্ছেদ করছেন খায়বার থেকে!

হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন! প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সেদিনের প্রতিটি কথা আজও আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। রাসূলের (সাঃ) সেদিনের কথার একটি বর্ণও আমি ভুলিনি।

নবীজী (সাঃ) তোমার দিকে ইঙ্গিত করে এ কথাও বলেছিলেন, "সেদিনটি অবশ্যই আসবে, যেদিন খায়বর থেকে মুসলমানরা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। তোমার উষ্ট্রিটিও তোমার পেছনে পেছনে ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে থাকবে।" অতপর ওমর বলেন, তাই আমি খায়বর থেকে তোমাদের উচ্ছেদ করবই। ইয়াহুদী বসতির মলিনতা থেকে খায়বরকে পবিত্র করতেই হবে।

যে ইয়াহুদী গোষ্ঠী এক সময় মুসলমানদের পায়ে পড়ে সাহায্যের ভিক্ষা করত, যাদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছিল, আজ তারা মুসলমানদের মাথার উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। একদিন ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে ট্যাক্স দিয়ে বসবাস করত, তারা আজ ফিলিস্তিনের বুকে চড়ে মুসলমানদের হৃদয় অনুভূতিতে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা মদীনা মুনাওয়ারা দখল করে মহা ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে।

এক সময় মুসলমানদের প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত যে খৃষ্টানদের মাথা গোজার এতটুকু নিরাপদ ঠাঁই ছিল না, এক খৃষ্টান ক্রুসেড কমান্ডার মুসলমানদের মোকাবেলায় নৌপথে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তার জন্মভূমিকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'মনে হয় জীবনে কোন দিন আর তোমার কোলে ফিরে আসতে পারব না আমি।' যে খৃষ্টশক্তি আমাদের উদ্যত সঙ্গীনের ভয়ে থরথর করে কাঁপত, যারা আমাদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করত, আমাদের গোলামী করে যারা জীবন বাঁচাত; আজ তাদের দাপটে মুসলিম শক্তি থরথর কম্পমান।

যে পৌত্তলিক হিন্দুরা এতদিন আমাদের মুসলিম শাসকদের আজ্ঞাবহ ছিল, মুসলিম শাসকদের চাটুকারিতা ছিল যাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন, আজ তারা আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে দিচ্ছে, আমাদের গিলে খেয়ে ফেলার জন্য মুখ হা করে আছে। কেন এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে? আমাদের এ বিপর্যয়ের কারণ কি?

আমরা আলিমদের নিকট বারবার শুনে আসছি, পৃথিবীতে ব্যাপকহারে অপরাধ ও অন্যায়-অপকর্ম বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর পক্ষ হতে আযাব নেমে আছে। কথাটিকে অনেকে সুযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এর প্রমাণ স্বরূপ তাদের কাউকে গিয়ে আপনি বলুন, 'কাশ্মীর ও আরাকানে মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হচ্ছে। তাদের জন্য

আমরা কী করতে পারি।" এ কথা বললে চট করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, ওরা নিজেদের গুনাহের শাস্তি ভোগ করছে। বসনিয়ার মুসলমানরাও তেমনি ভোগ করেছে নিজেদের পাপের আযাব।

এ ধরনের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কাশ্মীরে এক বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে তার কন্যার সাথে ভারতীয় বর্বর সৈন্যরা যে পৈশাচিক আচরণ করছে, সেরূপ আচরণ যদি আপনার সম্মুখে আপনার মেয়ের সাথে করা হয়, তা কি আপনি সহ্য করবেন? তিনি বললেন, "আমিও যদি সে পর্যায়ের গুনাহগার হয়ে থাকি, তাহলে অবশ্যই তা মেনে নেব।"

আসলে আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে জিহাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ খুঁজছি আমরা। অথচ আয়াতের মর্মার্থ খুঁজলে এর মূল কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের সামনে। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ.

"জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের (পাপ) দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।" (সূরা রূম ঃ ৪১)

এবার একটু ভেবে দেখি, কোন্ পাপের কারণে এ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আমাদের একটা রোগ হল, কেউ কোন মোস্তাহাব তরক করলেও তাকে বলে ফেলি, লোকটা মারাত্মক পাপ করে ফেলল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বহু অন্যায় কাজকে পুণ্য বলে চালিয়ে দিচ্ছি। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের এ সহজ কথাটি বুঝা উচিত যে, কোন ভূখণ্ডে বা সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম বিরোধী শক্তির নেতৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে পাপকর্ম বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকভাবেই। আর ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই।

তাই এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (রাহঃ) তাফসীরুল কাবীর-এর ১৮০ পৃষ্ঠায় ইমাম আবুবকর কাফফাল শাশী (রাহঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করা উম্মতে মুহাম্মদীর এক ফরয দায়িত্ব। যতদিন এ উম্মত সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, ততদিন তারা আল্লাহর আযাব-গযব হতে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের দু'আও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।

এরপর তিনি আরও বলেন, উৎকৃষ্টতম সৎ কাজ হল ইসলামকে অবলম্বন করে জীবন পরিচালনা করা এবং নিকৃষ্টতম পাপ কাজ হল,

কুফরী (আল্লাহদ্রোহিতা)। আর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কুফরী নির্মূলের পথ একটা, তাহল জিহাদ।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, যেহেতু তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজের নিষেধ কর।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি এভাবে করেছেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ হল, তোমরা জিহাদ কর। কেননা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই কুফরী নির্মূল হতে পারে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠারও এটাই একমাত্র পথ। এভাবেই পৃথিবীর বুক থেকে অন্যায়-অবিচার দূরীভূত হবে। অন্যায় ও অপকর্ম দূরীকরণের এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, তোমরা মানুষদেরকে আল্লাহর একত্ববাদে সাক্ষ্যদানের আদেশ করবে। যারা এ সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এরপর ইমাম রাযী (রাঃ) বলেন, "এ আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, জিহাদ সর্বোত্তম ইবাদত। কোন ইবাদতই এর সমান মর্যাদাপূর্ণ নয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা জিহাদের সমান মর্যাদা রাখে। নবীজী তাকে বললেন, 'জিহাদের সমান মর্যাদার কোন আমল আমি খুঁজে পাচ্ছি না।" (সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯০)।

জিহাদ ত্যাগ করা কবীরা গুনাহ

এ কথা সবাই স্বীকার করে যে, জিহাদ মুসলমানদের প্রতি কুরআনের মাধ্যমে উল্লেখিত একটি ফরয বিধান। আর এ কথাও সকলের জানা আছে যে, প্রিয়নবী (সাঃ) তার জীবনে বহুবার জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর জিহাদ হল মুমিন জীবনের পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ এক আমল। অথচ তারা একথা একবারও উচ্চারণ করেন না যে, জিহাদ পরিত্যাগ করাও এক মহাপাপ। যে কারণে আজ ব্যক্তি ও সমাজ থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে অবিচার, বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ধরনের

মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের উদ্দেশ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

يَآ ايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إذا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ إثاقَلْتُمْ إلى الاَرْضِ.

"হে মুমিনগণ! কি হল তোমাদের যে, আল্লাহর পথে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার কথা বললে তোমরা মাটি আঁকড়ে ধর!"

আল্লাহর এই ঘোষণা শোনার পরও জিহাদে যোগদানের আহবান জানালে অনেকে বলে, মুরব্বীদের মাশওয়ারায় জিহাদে যোগদানের ফয়সালা হয়নি। কেউ বলেন, সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারছি না ভাই। কেউ বলে, বউ-সন্তান ও সংসার ছেড়ে জিহাদে যাওয়া কি সম্ভব? অনেকে বলে, দ্বীনের আরও বহু কাজ আছে, তা করলেও হবে, জিহাদ করতে হবে কেন? আবার কেউ বলে, পেটের ধান্দা করতেই তো সময় চলে যাচ্ছে ইত্যাদি কত কথা কত রকম বাহানা।

ইতিপূর্বে আয়াতের তরজমায় বলা হয়েছে, "তোমরা তখন মাটি আঁকড়ে থাক।" অর্থাৎ- পার্থিব জীবনকে তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ আখেরাতের উপর। অথচ মুমিনের এ সংক্ষিপ্ত জীবন ও তুচ্ছ সম্পদকে আল্লাহপাক ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তা সত্ত্বেও কি তোমরা এ তুচ্ছ জীবনকে আল্লাহর রেজামন্দির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে জান্নাত লাভে কার্পণ্য করবে? তবে শুনে রাখ ঃ

فَما مَتاعُ الحيواةِ الدُّنيا فِى الآخِرَةِ إلا قَليلا.

"পার্থিব এ জীবন আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ।" (তাওবাহ ঃ ৩৭)

এরপর আল্লাহ তায়ালা এদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলছেন ঃ

إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذابًا اَلِيْمًا.

"যদি তোমরা জিহাদে গমন না কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন।"

কোন মুফাস্সির 'কঠিন শাস্তির' ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'একের বিরুদ্ধে অপরকে ক্ষেপিয়ে দেয়া হবে।' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সংঘাত, গোত্রীয় ও বংশগত কলহ, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে তোমরা নিজেরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করবে। বর্তমানে তা-ই হচ্ছে।

জিহাদ ত্যাগে ব্যক্তিগত শাস্তি

জিহাদ ত্যাগ করার ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাহীন বিপর্যয় নেমে আসে। তখন সাহস হারিয়ে মানুষ ভীরু হয়ে যায়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আজকাল মানুষকে ভীরুতা নিয়েও গর্ব করতে দেখা যায়। সৌখিন ভঙ্গিতে তারা বলেন, আমার স্বভাব এতই নাজুক যে, একটু কঠোর শব্দ শুনলেই হৃদয় কাঁপতে থাকে ও হৃদপিন্ডে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। তা শুনে অন্যরা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, লোকটা বড় নিরীহ মানুষ।

অথচ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষের নিকৃষ্টতম অভ্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ভীরুতা (যার ফলে জিহাদের ময়দানে তার শরীর কাঁপতে থাকে) দ্বিতীয়টি হল, চরম কৃপণতা। (যার ফলে সে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে)।' (সুনানে কুবরা বায়হাকী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭০)।

উল্লেখ্য যে, যেসব বিষয় আল্লাহর নবী নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন, তা কখনও প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এসব খারাপ চরিত্র পরিত্যাগ না করলে কঠিন গুনাহগার হতে হবে নয় কি?

আজ আমরা সাহসিকতা ও বীরত্বের অঙ্গন পরিত্যাগ করে কবুতর ছানা ও খরগোশের চেয়েও বেশী ভীরু হয়ে পড়েছি। ফলে আমরা অন্যের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হচ্ছি। মানুষের ব্যক্তি জীবনে এসব বিপর্যয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ ماتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفاقٍ.

"যে ব্যক্তি জিহাদ করল না, জিহাদে গমনের ইচ্ছাও মনে পোষণ করল না, সে এক প্রকার মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।" (কানজুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩)।

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ তিরমিজী ও কানজুল উম্মাল-এ উল্লেখিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সমীপে এ অবস্থায় হাজির হল যে, তার শরীরে জিহাদের কোনই চিহ্ন নেই, তাহলে সে আল্লাহর নিকট অসম্পূর্ণ ইসলাম নিয়ে উপস্থিত হল।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে জিহাদের মাধ্যমে সুসংহত করল না তার মুসলিম জীবন কখনও পূর্ণতায় পৌঁছবে না। আর যে বিষয়ে নবীজী (সাঃ) মানুষের মুনাফিক হওয়ার মত কঠিন দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন, তা যে কত মারাত্মক পাপ, সে বিষয়টি কি আমরা ভেবে দেখেছি?

জিহাদ ত্যাগের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

প্রত্যেক পাপের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন মুসলিম উম্মাহ পোশাক-পরিচ্ছদে ও চালচলনে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অনুকরণ না করলে, তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে। মহিলারা পর্দা পালন না করলে এর শাস্তি তাদের পেতে হবে। কিন্তু জিহাদ পরিত্যাগ করা সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। কেননা তা ডেকে আনে এক সীমাহীন ও সর্বব্যাপী বিপর্যয়। কারণ জিহাদ পরিত্যাগ করলে স্বয়ং আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। যে মহান সত্তা আমাদের মানুষ ও মুসলিমরূপে সৃষ্টি করে গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আমরা সেই মানুষরা নিজেদের জীবনের মায়ায় সেই মহান সৃষ্টিকর্তার পবিত্র দ্বীনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছি প্রতিনিয়ত।

আজ কোথাও কুফরী চক্র আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে পরিহাস করছে, কোথাও ধ্বংস করা হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহ, কোথাও বা জ্বালিয়ে ছারখার করা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, কোথাও কুফরী শক্তি কর্তৃক মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে, মুসলমানকে তার বাড়ী-ঘর থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হচ্ছে, তার সম্পদ দখল করে নিচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে একের পর এক মুসলিম জনপদ। এসব যে জিহাদ পরিত্যাগ করার পরিণাম, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? যারা এ কথা অস্বীকার করতে চাইবেন, তারা এর আগে একটু ভেবে নেবেন তাদের ঈমানটা কি অবস্থায় আছে।

মূলতঃ জিহাদী তৎপরতায় মুসলমানদের নির্লিপ্ততার কারণে দ্বীনের সঠিক দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পথে। মুসলমানরা ইসলাম বিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে চরমভাবে। যারা আজ ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন বরণ ও পালন করছে, তারা পাশ্চাত্যের তামাশার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিহাদ ত্যাগ করার ফলে মুসলিম জাতি আজ সীমাহীন বিপর্যয়ে নিপতিত রয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সেই বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে ঃ

'হ্যাঁ, সেইরূপ দুর্দিনও বয়ে যাবে তোমাদেরই উপর দিয়ে, যখন কুফরী শক্তি তোমাদের নির্মূল করার জন্য পরস্পরকে ডাকতে থাকবে, যেমন ক্ষুধার্ত লোকদেরকে খানার আসরে ডাকা হয়। আর কুফুরীচক্র তোমাদেরকে বেছে বেছে মুখের গ্রাসে পরিণত করবে।'

অর্থাৎ মুসলিম নিধনযজ্ঞে ইহুদীরা ডাকবে হিন্দুদেরকে, হিন্দুরা ডাকবে খৃষ্টানদেরকে, খৃষ্টানরা ডাকবে ইহুদী ও বৌদ্ধদেরকে। সবাই মিলে মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করার উন্মত্ততায় মেতে উঠবে। দুনিয়ার বহু মুসলিম এলাকায় এখন তা-ই ঘটছে।

রাসূলের (সাঃ) উপরোক্ত বক্তব্য শুনে সাহাবীগণ তো হতবাক। তারা ভাবলেন, প্রিয়নবী (সাঃ) বলেন কি? ওহুদের যুদ্ধে আমরা ছিলাম মাত্র ৩১৩ জন। তখন এক হাজার কাফির যোদ্ধাকে আমরাই তো চরমভাবে পরাস্ত করেছি। এই পরাজিত শক্তি একদিন আমাদেরকেই নির্মূল করে দিতে উদ্ধত হবে?

চিরবিজয়ী সাহাবীগণ চরম বিস্ময়ের সাথে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি মুসলমানরা সংখ্যায় কম হবে?"

প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন ঃ

"না, সংখ্যায় বরং তোমরা বেশী হবে।

وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ.

"পানির স্রোতের নিঃসীম ফেনার অগনিত বুদবুদের মত হবে তোমরা সংখ্যায়। কিন্তু তোমাদের মাঝে শক্তি, প্রতাপ ও সংহতি বলতে কিছুই থাকবে না।"

এবার সাহাবীগণ পূর্বের চেয়ে শতগুণ বেশী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আর কি ঘটবে? তিনি বললেন, "শত্রুর মন থেকে তোমাদের ভীতি দূর করে দেয়া হবে।"

আজ মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এর চেয়ে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম নয়। ইসলামবিরোধী শক্তির মনে মুসলমানদের সামান্যতম প্রতাপটুকুও অবশিষ্ট নেই। কারণ তারা জিহাদ পরিত্যাগ করেছে। যেমন সাপকে সবাই ভয় করে, কিন্তু তার বিষ বের করে দেয়ার পর সাপটি খেলার বস্তুতে পরিণত হয়। ছোট শিশুও তখন তাকে নিয়ে খেলতে চায়। তামাশা দেখার জন্য

মানুষ তার চারপাশে ভীড় জমায়। মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আজ হুবহু এরূপ নয় কি?

মুসলমানদের পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই আছে, মুসলিম দেশের সরকারদেরকে নিয়ে বাতিল শক্তি পুতুল খেলছে। মুসলিম নারীদের বিক্রি হওয়া ইজ্জত টিভি-সিনেমার পর্দায় পাশবিকতায় উন্মাদের দল প্রতিনিয়ত উপভোগ করছে। আজ নারীর মর্যাদা নেই, মুসলিম পুরুষের পৌরুষ নেই; সকলে আজ তাদেরকে নিয়ে দাবা খেলছে। ভাবতেও কষ্ট হয় বীভৎস এই পরিণাম।

এমনও এক সময় ছিল, তখন মুসলমানরা কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে পদার্পণ করলে, কেউ তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেত না। জিহাদী কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আজ কাফিররা হত মুসলমানদের প্রজা। কিন্তু জিহাদ পরিত্যাগ করার ফলে উল্টো মুসলমানরা বৃটেন, আমেরিকায় জুতা সেলাই ও বেয়ারা-বাবুর্চির চাকরি করে গর্বিত হয়। মর্যাদাবান মুসলিম জাতি আজ সামান্য রুটি–রুজির সন্ধানে কানাডা, জার্মানীতে নিজেদেরকে কাদিয়ানী পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করছে। এর চেয়ে অপমানজনক বিষয় আর কি হতে পারে।

সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কোন্ পাপের কারণে তারা এমন বিপর্যয়ের শিকার হবে?

নবীজী (সাঃ) বললেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

–এর কারণ দুনিয়ার মোহ ও মৃত্যুর ভয় তোমাদের মন-মগজে আসন গেড়ে বসবে। তখন মুসলমানরা নানা রঙের কথা বলবে। বলবে, আমরা দ্বীন পালন করব ঠিকই, কিন্তু সম্পদের মোহ ত্যাগ করব কিভাবে?

তারা বলবে, হে আল্লাহ, জীবনটা রক্ষা করে তুমি আমাকে দ্বীনের সব কাজ করার তাওফীক দাও। আমরা দ্বীনের সব ধরনের খেদমত করতে রাজি আছি, তবে সে কাজ তো সম্ভব নয়, যে কাজে কারাবরণ করতে হয় ও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়। দ্বীনের সেরূপ খেদমত করতে কেমন করে রাজী হই, যে কাজে সযত্নে পালিত এই দেহের গোস্ত খুবলে নেয়া হয়। দ্বীনের কাজ করতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বুকের তাজা রক্ত ঝরাই কেমন করে।

মুসলমানদের এ ধরনের একটি ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরেছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। এই কলঙ্ক চরিত্রগুলো আমাদের মাঝে নেই কি? আসলে হাদীসে উল্লেখিত সেই হতভাগাদের দল যে আমরাই, তাতে এখন আর সামান্যও সংশয়ের অবকাশ নেই। তবুও আমাদের হুঁশ হচ্ছে কই?

এমন সোনালী যুগও অতীত হয়েছে, যখন পারস্যের সেনাপতি রুস্তম মুসলিম সেনাদের বলেছিল, 'তোমরা দেশে ফিরে যাও। অন্যথায় তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করব।' তখন মুসলিম সেনাপতি সাঈদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস মতান্তরে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তিরস্কার করে রুস্তমকে বলেছিলেন, 'আমরা নিরস্ত্র হাতে এখানে এসেছিলাম, তোমার এ হুমকির আগেই আমাদের পলায়ন করা উচিত ছিল। যখন পালাইনি তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে বুঝা যাবে কার মুরোদ কতটুকু।'

কোন এক কাফির সম্রাট মুসলিম সেনাপতি খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে (রাঃ) তিরস্কার করে বলেছিল, 'আরে! কি জন্য এসেছ তোমরা আমাদের দেশে?'

খালেদ ইবনে ওয়ালিদ অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তাকে বললেন, 'তোমাদের রক্তের স্বাদ নেশা ধরিয়েছে আমাদের মনে। তাই ছুটে এসেছি তোমাদের দেশে।'

সম্রাট অবাক্ তাকিয়ে রইল। এ কথা শুনে আর কিছুই বেরুল না তার মুখ থেকে।

একবার রোমীয় বাদশাহ নাকুর মহামতি হারুনুর রশীদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখল ঃ

'আমরা আপনাকে এ পর্যন্ত বহু ট্যাক্স দিয়ে এসেছি, এখন থেকে আর ট্যাক্স দেব না। আজ থেকে আমরা স্বাধীন।'

পত্রের উত্তরে হারুনুর রশীদ লিখলেন ঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হারুনুর রশীদ-এর পক্ষ থেকে রুমী সারমেয় নাকুরের প্রতি। আমি তোমার পত্রের লিখিত উত্তরে দিচ্ছি না। আমার উত্তর স্বচক্ষে দেখতে পাবে।'

অতি দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে হারুনুর রশীদ নাকুরের আঙ্গিনায় পৌছে গেলেন। হঠাৎ স্বসৈন্য সম্রাটকে দেখে চুক্তি ভঙ্গকারী বিদ্রোহী নাকুর

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে রইল। সম্বিত ফিরে এলে নাকুর হারুনুর রশীদ এর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল এবং পুনরায় ট্যাক্স দেয়ার অঙ্গীকার করল।

আমরাও তাঁদেরই সহযাত্রী।

আরব, আফ্রিকা, আমেরিকা, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশের যুবক-তরুণরা যদি ইসলামের জন্য আফগান ভূমিতে এক কাতারে দাঁড়িয়ে জীবন দিতে পারে, তবে আমি ও আপনি পারব না কেন? আমরা ত তাদেরই সহযোগী সহযাত্রী ছিলাম। এক তাঁবুতে রাত কাটিয়েছি। এক দস্তারখানে ভাত খেয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমরাও অস্ত্র হাতে কাশ্মির, ফিলিস্তিন, মেন্দানাও, চেচেনিয়া ও আরাকানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে কাফির জালিমের মুকাবিলায় যুদ্ধ করব, দুশমন মারব। আল্লাহর পথে নিজেরাও মরব। তখন আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করব ঃ

فَلستُ أُبَالى حينَ اُقتَلُ مُسلما- على اي شِقٍّ كان للهِ مَصرَعِى.

"হে আল্লাহ! তোমার হাতে যখন জীবন সোপর্দ করলাম, তখন একথা ভাবি না যে, আমার শরীরের কোন্ স্থানে আঘাত লাগল।"

প্রকাশ্য পাপ

জিহাদ পরিত্যাগ করা এক মস্তবড় পাপ। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ শুধু জিহাদ পরিত্যাগের পাপেই লিপ্ত নয়, বরং তাদের অনেকে জিহাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পাপেও লিপ্ত রয়েছে। এই ধরনের লোকদেরকে মুনাফিক আখ্যায়িত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, ওরা নিজেরা জিহাদে ত যায়-ই না, পরন্তু অন্যদেরকেও জিহাদে যাওয়া থেকে বারণ করে থাকে। তাই বলা হয়েছে ঃ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّٰهِ.

"পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করছে এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করছে।"

মুনাফিকরা অন্যদেরকে বারণ করে বলছে ঃ

لَا تَنْفِرُوا فِى الحَرِّ.

"এ গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।"

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا.

"(হে নবী!) তাদের জানিয়ে দিন, জাহান্নামের অগ্নির উত্তাপ প্রচণ্ডতম (তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করার পাপ দ্বারা যে আগুন প্রজ্বলিত করেছ)।"

প্রকাশ্যে ও দম্ভভরে যে পাপ করা হয়, তার শাস্তি বড়ই কঠিন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানুবী দাঁড়ি সম্পর্কিত এক আলোচনায় হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

"গোটা উম্মতকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যারা প্রকাশ্যে ও দম্ভভরে পাপ করে তাদের ক্ষমা নেই।"

আমরা জিহাদ পরিত্যাগ করেছি এবং একে গর্বের বিষয় মনে করছি। উপরন্তু এ কঠিন অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছি না। এ পাপের অনুশোচনায় দু'ফোঁটা অশ্রুও আমাদের চোখ থেকে ঝরে না। জিহাদ ত্যাগ করার অপরাধের কথা স্বীকার করে দু'হাত তুলে কোন দিন কি আমরা আল্লাহর দরবারে এ কথা বলেছি ঃ ওগো মাওলা! এ যাবত এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে ভীষণ অবহেলা করেছি আমরা, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও।

পক্ষান্তরে নবীজী (সাঃ) যে কাজ করতে বারণ করেছেন, আমরা সেসব হরদম করে যাচ্ছি। জনৈক সাহাবী একবার কোথাও সবুজ-শ্যামল মনোরম বৃক্ষঘেরা এক গুহা দেখে বললেন, আমি লোকালয় ছেড়ে এ গুহায় অবস্থান করব। এ গুহায় বসে একাগ্রচিত্তে বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকব। নবীজী (সাঃ) তার এ সংকল্পের কথা জানতে পেরে বললেন ঃ

إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ.

"আমি ইহুদী অথবা খৃষ্টানদের সন্ন্যাসবাদ নিয়ে প্রেরিত হয়নি। আমি তো এসেছি মিল্লাতে হানীফ নিয়ে।"

وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ او
رَوْحَةَ خيرٌ من الدنياَ وما فيها

'শোন লোক সকল! সে সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন। এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর পথে জিহাদ করা দুনিয়া ও তার মাঝে অবস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।'

কাযী ইয়ায মালেকী (রাহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, কাউকে যদি পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পদ দেয়া হয়, আর যদি সে ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেয়, তার এ আমল মুজাহিদের একটি সকালের আমলের সমানও হবে না।

আমরা কি করছি

পবিত্র কুরআনের সূরা 'মুহাম্মদ'-এর অপর নাম 'কিতাল'। উক্ত সূরার একখানা আয়াত পড়ে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। ঐ আয়াতে এত কঠিন শাস্তির ঘোষণা সত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না!

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মক্কী জীবনে বহু মজলুম মুসলমান আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! কাফিরদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ, তুমি আমাদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দাও।

নবীজীর সমীপেও তারা ব্যাথাভরা হৃদয়ে আবেদন জানাতেন, আমাদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দিন। এই প্রেক্ষাপট মনে করিয়ে দিয়ে আল্লাহপাক সূরা কিতালে বলেন ঃ

فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

"যখন জিহাদের স্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত বিধান অবতীর্ণ হয়, তখন যেসব লোকদের মনে (নিফাকের) ব্যাধি রয়েছে, তাদের দেখতে পাবেন, তারা আপনার দিকে মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত চেয়ে আছে।"

আসলে মুনাফিকদের গুড়গুড়, ঘোমটাবাজী আর ফিসফিসানি ধরনের কর্মকাণ্ডে আল্লাহপাকের ক্রোধ জাগ্রত হয়। হবেই বা না কেন, কিছু লোক রাসূলের (সাঃ) আহবান শুনে দৃঢ় মনে জিহাদের ময়দানে ছুটে যায়। কেউ নববধূ ও বাসর উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লাহর দুশমনের

মোকাবেলায়। স্বয়ং রাসূলও (সাঃ) রণাঙ্গনে রক্ত ঝরাচ্ছেন, এমন সঙ্গীন সময়ে তথাকথিত কিছু দুর্ভাগা জিহাদকে এড়িয়ে ঘুরঘুর ফিসফিস করছে। জিহাদের আদেশ তারা শুনেও শুনছে না যেন। এদেরকে উদ্দেশ করেই রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاَوْلٰى لَهُمْ

"ধ্বংস হোক এসব লোক।"

দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে কিন্তু তাদেরই অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। জিহাদের আলোচনা শুনলে আমরা গুড়গুড় গুজ গুজ করি, সুযোগ বুঝে মুজাহিদদের তিরস্কার করি। অথচ জিহাদের নির্দেশ জানার পর তাতে অংশগ্রহণ না করলে তজ্জন্য আল্লাহপাক কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

জিহাদ রাজনীতি না ইবাদত

একথা আমাদের ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত, জিহাদ তথাকথিত কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, আল্লাহর এক অলংঘনীয় বিধান, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদাত; যে বিধান ও ইবাদতের কথা পবিত্র কুরআনের এক ষষ্ঠমাংশ জুড়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইবাদত কাকে বলে? যে কাজকে প্রিয়নবী (সাঃ) ভালোবেসেছেন, নিজে যা করেছেন, যা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং যা করতে আদেশ করেছেন, কেবল তাই ইবাদত বলে বিবেচিত হয়।

অতএব, যা ইবাদত, তা-ই আমি করব। এটা আমার দায়িত্ব, আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাই। কেউ না করলেও আমি তা করব। ইবাদতকারীর ত্রুটির কারণে কোন ইবাদতের ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করা যায় না। নামাযীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে নামায ফরজ হওয়া রহিত হয় না। তাহলে আমাদের কিছু লোক এ অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ থেকে কিভাবে বিমুখ থাকছে যে, মুজাহিদদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে।

কেউ বলছেন, মুজাহিদরা আপোসে মারামারি করে, তাদের মাঝে বহু গর্হিত ও অন্যায় দেখা যাচ্ছে। অতএব আমি জিহাদ করব না। অনাকাঙ্খিত হলেও মানুষের মাঝে পরস্পরে দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক, পাপ ও অন্যায় করা আরও স্বাভাবিক। কেননা মানুষ এসব এড়িয়ে চলার ব্যাপারে

নিতান্তই দুর্বল। আর মুজাহিদরা তো অতিমানব নয়। তাদের ভেতর দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয় মোটেই। অতএব এসব অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মোটেই সঙ্গত নয়, বরং তা হবে এক মারাত্মক অপরাধ।

আমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহপাক মুজাহিদদের পাপ মাফ করে দেয়ার জন্য অত্যন্ত সহজ পথ তৈরী করে রেখেছেন। তাহল, প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

عِنْدَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهٖ يُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ

'শহীদের প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্র তার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।' (কানযুল উম্মাল ঃ পৃ ঃ ২১০, খ ঃ ৪র্থ)

আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা জিহাদ ত্যাগ করে যে পাপের ভাগী হয়েছি, সেদিকে কি একবারও লক্ষ্য করেছি? আমরা তো কখনও জিহাদে যাওয়ার সংকল্পও করিনি, যা মুনাফিকের অন্যতম আলামত। আমরা তো জীবনে কখনও বন্দুক ও তরবারী ছুঁয়েও দেখিনি। অস্ত্র কাকে বলে তাও জানি না। অথচ নবীজী (সাঃ) সাতাশবার অস্ত্র হাতে শত্রুর মু-খোমুখি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর আমরা রাসূল (সাঃ)-এর এই মহান আমলটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছি। ভেবে দেখেছি, আমরা কত বড় পাপী? অথচ মুজাহিদদের পাপ খুব করে আমাদের চোখে পড়ে। নিজেরা যে কত বড় পাপী সে দিকে একবার লক্ষ্য করেছি কি?

ঈমান ভূলুণ্ঠিত আজ

জিহাদ পরিত্যাগ করার মত বড় গুনাহ হতে আমরা শিগগিরই তাওবাহ করি। নতুবা যে কোন সময় আমাদের উপর কঠিন কোন শাস্তি আপতিত হওয়ার চরম আশংকা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (সাঃ) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

من لم يَغزُ وَيُجَهِّزْ غازِيا اَوْ يُخلف غازِيا اَهلَه بِخَيرٍ
اصابَه الله بِقارِعَةٍ قبلَ يَومِ القِيامَةِ

'যে ব্যক্তি স্বশরীরে জিহাদ করল না বা কোন মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিল না বা কোন মুজাহিদ পরিবারের

তত্ত্বাবধান করল না, তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর আল্লাহপাক কোন কঠিন শাস্তি আপতিত করবেন।' (কানযুল উম্মাল ঃ ২১৩ পৃ ঃ, ৪র্থ খন্ড)।

মৃত্যুর পূর্বে সে ব্যক্তি মারাত্মক কোন রোগ বা কঠিন কোন বিপদে অবশ্যই নিপতিত হবে। তখন কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। কারণ জিহাদে যোগ না দেয়ার মাধ্যমে সে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও ইসলামের সার্বিক বিজয় সম্পর্কে অমার্জনীয় উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। যার ফলে তখন আল্লাহও তার প্রতি বিরাগভাজন থাকবেন স্বাভাবিকভাবেই। কেননা, সে মজলুম মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِرْحَمُوا مَن فى الاَرضِ

'তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর,

يَرْحَمُكُمْ مَن فى السَّماءِ

তবে আকাশবাসী দয়া করবে তোমাদের উপর।'

আমরা প্রতিদিন পত্রিকায় মুসলিম গণহত্যার সংবাদ পড়ছি। তবুও এতে আমাদের মনে সামান্য দুঃখবোধ জাগ্রত হয় না। অথচ নবীজীর কঠোর বাণী নিত্যদিন সতর্ক করছে আমাদেরকে ঃ

مَنْ لم يَهْتَمَّ لِاُمورِ المسلِمِينَ فلَيسَ مِنا

'যে লোক মুসলমানদের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাল, সে আমাদের কেউ নয়।'

রাসূলের (সাঃ) এ কঠোরবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বহু লোক আয়েশ করে বলছে, কোথায় কি ঘটছে আমরা তা কি জানি! বড়ই উৎকণ্ঠামুক্ত তারা। বহু আরামেই কাটছে তাদের দিনকাল।

ওহে দুর্ভাগা! এখন কি তোমার আয়েশ করার সময়? আজ দ্বীনের উপর চলছে চতুর্মুখী হামলা। ঈমান নিয়ে চলছে বেচাকেনা, ছিনিমিনি খেলা। কুফরী চক্র পবিত্র কাবা ও মদীনা দখল করার লক্ষ্যে প্রতিদিন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে। বহু দেশের মানুষ ওয়াজিব কুরবানীর আমল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মুসলমানরা কোর্ট-আদালতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারপরও তোমরা মনে করেছ কিছুই হয়নি আমাদের, সবকিছু ঠিকঠাক আছে?

ইসলামের মর্যাদা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। সবাই আপন মর্যাদা চিন্তায় ব্যস্ত। অথচ আমার নবীজী (সাঃ) নিজ ইজ্জত বিকিয়ে দিয়ে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। আমরা কি একথা একবারও ভাবছি, আল্লাহর দ্বীন স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হলে কী স্বার্থকতা রয়েছে আমাদের সম্মান ও জীবনের।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমার নামায, আমার কুরবানী, আমর জীবন ও মৃত্যু সেই আল্লাহর জন্য যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক।"

এ কথাই হওয়া উচিত আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপলব্ধি।

শহীদের ত্যাগ

জিহাদ পরিত্যাগ করার পরিণতিতে বিপর্যয় আসবে অনিবার্যভাবে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী বলেন, রাশিয়া আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করার স্পর্ধা দেখানোর পিছনে কারণ হল, রাশিয়া বুখারা-সমরকন্দসহ মধ্য এশিয়া দখল করে নেয়ার সময় সেখানের মযলুম মুসলমানের হাহাকার ও আর্তচিৎকারে যখন পৃথিবীর আকাশ ভারী হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা সতর্ক ও বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ না নিয়ে কিতাবের পৃষ্ঠা ঘেটে দেখতাম, বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া।

আল্লাহপাক হযরত মাওলানা ইরশাদ আহমাদ শহীদ (রাঃ), তার সহগামী শহীদ ও সহযোগী মুজাহিদদের উত্তম জাযা দান করুন। দশ কোটি পাকিস্তানীর পক্ষ থেকে তাঁরাই প্রথম রুশ শক্তির অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে খুন ও জীবনের নজরানা পেশ করেছিলেন। অন্যথায় অবিলম্বে সে কালো দিন এসে উপস্থিত হত, যেদিন রুশ বাহিনী বিজয়ীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করত, বেলুচিস্তান আর কত দূর? করাচী বন্দর পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে? তারা অনতিবিলম্বে এ দিকেই অগ্রসর হয়ে আসত। কারণ, আফগানিস্তানে পাহাড় আর পাথর ছাড়া কি আছে, যা তারা লুটে

নেবে?

সাধারণ লোকের ধারণা এবং মুজাহিদদের অবস্থা

সাধারণ লোকের ধারণা অনুধাবন করুন, তারা বলে মুজাহিদরা তো মৌজের সাথে দিন কাটাচ্ছে। আসলে মুজাহিদরা আর্থিকভাবে কত সংকটে আছে, তা কেবল মুজাহিদরাই জানে। আমি এ ব্যাপারে বেশী কিছু বলতে চাই না। এসব দুঃখজনক ধারণার অবসানকল্পে দায়িত্বশীল অনেকে এ ব্যাপারে দু'চার কথা বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন, যেন লোকে জানতে পারে, মুজাহিদের ফান্ডে কোথা থেকে টাকা-পয়সা আসে।

অনেক লোক মনে করে, আমরা খুব ভালো অবস্থায় আছি, দামী ও উন্নত গাড়ী-বাড়ীও আমাদের আছে। আর্থিক কোন সমস্যা আমাদের নেই।

অথচ আমাদের 'মাসিক সদায়ে মুজাহিদ' পত্রিকাটি অত্যন্ত টানাটানির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটি জনমানসে জিহাদের দাওয়াত ও দর্শন প্রচারে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পান করে আসছে। পবিত্র হজ্ব ও ওমরা পালন করতে গেলে কা'বার চত্বরে বসে যখন আমি দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বহু দরখাস্ত পেশ করি, তখনও এ পত্রিকাটির কথা আমি ভুলি না। বর্তমানে এ পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ও পাঠকপ্রিয়তা সত্যিই এক ঈর্ষণীয় বিষয়।

সেই পত্রখানা এখনও আমার নিকট সংরক্ষিত আছে, যাতে উল্লেখিত ছিল এ পত্রিকা পাঠ করে যে বোনটি তার ভাইকে জিহাদে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করে। এক পর্যায়ে তার আদরের ভাই জিহাদে অংশ নেয় এবং শাহাদাত লাভে ধন্য হয়।

অত্যন্ত কঠিন এক সময় উপস্থিত হল। আর্থিক সংকটে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আমরা পাঠকদের নিকট চিঠি লিখলাম, আপনারা দ্রুত গ্রাহক চাঁদা নবায়ন করুন এবং বকেয়া পরিশোধ করুন, নতুবা আর একটি সংখ্যাও বের করা সম্ভব নয়।

এক সপ্তাহ পর জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরোর মত একখানা পত্র এসে আমার হাতে পৌঁছল। পত্রখানা পড়ে আমি শিহরিত হলাম, আমার শরীরের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে যায়। এই পত্রখানা সেই ব্যক্তির পিতার

যে দীর্ঘ ছ'মাস পর্যন্ত রণাঙ্গনে মুজাহিদদেরকে কমান্ডো ট্রেনিং দিয়েছিল এবং জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় তার বাহাদুরী ছিলো প্রবাদতুল্য। আজও আমাদের কেউ সেই প্রিয় কমান্ডার সরওয়ার শহীদকে ভুলতে পারনি। তার পিতা এই পত্রখানা আমার নিকট লিখেছিলেন। তিনি লিখেন ঃ

"আমার পক্ষে পত্রিকার আগামী বছরের চাঁদা বাবদ আশি টাকা পরিশোধ করা আদৌ সম্ভব নয়। আমার আর্থিক সংকট বর্ণনাতীত। কমান্ডার সরওয়ার শহীদের ছেলে-সন্তানদের মুখে দু'বেলা ডাল-রুটি তুলে দেয়ার সামর্থও আমার নেই। আমি বড়ই অভাবী। যদি সম্ভব হয় আমার জন্য নিয়মিত একটি সৌজন্য সংখ্যা পাঠানোর অনুরোধ রইল।"

সেদিনই দৃঢ়সংকল্প করলাম, ইনশাআল্লাহ কখনও আর এই পত্রিকা বন্ধ করা যাবে না।

কমান্ডার আবদুর রশীদ শহীদ-এর সংসারের খবর আর কি বলব, পাঁচ-ছ' মাস পরে হাতে টাকা আসলে তার অসহায় পিতা ও বৃদ্ধা মা'র হাতে কিছু টাকা তুলে দিয়ে আসি। তাদের জীবন নির্বাহ এরই উপর নির্ভরশীল। এবার আন্দাজ করুন, মুজাহিদ ও শহীদদের পরিবার কত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তবুও কিছু লোকে বলে, মুজাহিদরা খুব আয়েশে আছে। প্রকৃত খবর না জেনে এভাবে মন্তব্য করা খুবই দুঃখজনক বৈ কি।

আমাদের প্রতিজ্ঞা

এ হল মুজাহিদ ও শহীদ পরিবারের অবস্থা। আগামীকাল বা যে কোন দিন আমাদের পরিবারও এমন কঠিন দিন যাপনের শিকার হতে পারে। কোন অনুযোগ ছাড়াই এ পরিস্থিতি আমরা বরণ করে নিতে রাজি আছি। কিন্তু আমরা কখনও এ পরিস্থিতি বরদাশত করতে রাজি নই যে, কোথাও কোন মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হবে আর সেই জালিমের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে কেউ তরবারী হাতে দৌড়ে আসবে না।

আমার সংসার ও জীবন যতই টানাপড়েনে থাকুক, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁতরাতে থাকুক আমার স্ত্রী ও সন্তানরা, তবুও আমরা আল্লাহর দুশমনের মোকাবেলায় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে যাব চিরদিন।

আমার প্রিয় রাসূল (সাঃ) মুরগী-পোলাও খেয়ে যুদ্ধ করেননি। তিনি যুদ্ধ করেছেন পেটে পাথর বেঁধে। রাসূল (সাঃ) জীবনের সে চিত্র আমাদের সামনে অনুপস্থিত নয়। আমাদের প্রতিটি যুবক সে চিত্র অনুযায়ী আমল করতে বদ্ধপরিকর। শহীদগণ আমাদের জন্য যে পথ নির্মাণ করে গেছেন– প্রিয় মুজাহিদ ভায়েরা! শহীদের রক্তে সিঞ্চিত সেই পথই আমাদের একমাত্র চলার পথ। এ পথেই আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, যদিও এ পথ পিচ্ছিল বটে। এ পথে চলতে গেলে বিষাক্ত কাঁটা ফুটে পা বিষিয়ে তুলে। যদি হিমালয়সম বাঁধাও পথ রোধ করে দাঁড়ায়, যদি বড় পদ ও চাকুরির প্রলোভন দেখান হয়, তবুও তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ কর না। বৈধ চাকুরি নির্দোষ বটে, কিন্তু জিহাদ ত্যাগ বা বর্জন করা মহা অন্যায়। আমাদের প্রতিটি সাথীকে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতে হবে এবং বাস্তবে প্রমাণ দিতে হবে যে, জিহাদ আমাদের নিজস্ব কাজ। প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের মতই জরুরী বিষয়।

সমগ্র পৃথিবীর সকল শক্তি আমার বিরোধিতা করতে পারে, তবুও আমার পক্ষে জিহাদী তৎপরতা বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। যদি আমাকে সর্বস্বহারা করা হয়, তবুও আমাকে লড়তে হবে খালি হাতেই। আমৃত্যু জিহাদ করব, এই আমার জীবনের একমাত্র পণ।

নবীর আহবানকে হেলা কর না

আমার প্রিয় নওজোয়ান, নবীন ভায়েরা! আজ প্রয়োজন সাহসী পদক্ষেপের। আমরা যদি এখনও জেগে না উঠি, তবে আপন-পর সবাই মিলে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আমরা যদি এখনও নীরব থাকি, তবে এ জনপদে পুনরাবৃত্তি ঘটবে বাগদাদের ইতিহাসের।

হে দ্বীনের রক্ষকেরা!

হে উম্মতের যুবকেরা!

মনে রাখবে, আমাদের শরীরের খুন হযরত হানযালার খুনের চেয়ে দামী নয়। আমাদের রক্ত ও জীবন প্রিয় (সাঃ)-এর জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান নয়। যদি কেউ তোমাকে বলে, জিহাদে যোগদান না করে এখানে থেকে কাজ কর, এ ক্ষেত্রে তোমার অনেক দরকার, তুমি সে কথা শুনবে না।

দ্বীনের সকল ক্ষেত্র সতেজ রাখা দরকার। যেখানে থাক, যে ক্ষেত্রে কাজ কর সেখানে মুজাহিদের মত দিন যাপন কর। হৃদয়ের মাঝে জ্বালিয়ে রাখ জিহাদী জয্‌বার অনির্বাণ মশাল।

একবার ফিরে তাকাও চৌদ্দশ' বছর পূর্বের আদর্শ নবীর যুগের দিকে। আমার নবীজী তো কেবল মৌখিকভাবে মানুষকে জিহাদের দিকে ডাকেননি। নবীজী প্রথমে দ্বীনের পথে নিজের খুন ঢেলে পরে অন্যান্যকে ডেকেছিলেন জিহাদের পথে খুনের নজরানা দিতে।

আমাদের কথা না হয় নাই শুনলে। আলিম–ওলামার কথার গুরুত্ব না-ই বা দিলে; আমি বিশ্বাস করি, মুসলমান মাত্র নবীজীর কথা কেউ হেলা করতে পারে না।

নবীজী ওহুদ রণাঙ্গনে আপন শরীরের তপ্ত লহু ঝরিয়ে উম্মতের প্রতিটি সদস্যকে বাস্তব ক্ষেত্রে জানিয়ে দিলেন, আমার রক্তে ভেজা এ পথে চললে তবেই তোমরা হাউজে কাওসারের পাড়ে আমার সাক্ষাৎ পাবে। যদি আমার রক্তে ভেজা এ পথে তোমরা বিরামহীন চলতে থাক, তবেই পৃথিবীর কোন কাপালিক অপশক্তি তোমাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পাবে না।

বন্ধুরা! হেলা কর না আমার নবীজীর মিশন ও দাওয়াতকে। আমার নবীজী আপন শরীরের খুন ঝরিয়েছেন। কলিজার টুক্‌রো উৎসর্গ করেছেন দ্বীনেরই স্বার্থে। প্রিয় সহচর যায়িদ ইবনে হারিছার শাহাদাতের মর্মান্তিক সংবাদও তাকে শুনতে হয়েছে। তাকে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মত ক্ষণজন্মা সাহসী ব্যক্তিকে চিরদিনের জন্য হারাতে হয়েছে– চাচাতো ভাই জাফর তাইয়্যারও শহীদ হলেন চোখের সামনে; তারপরও নবীজী লড়াই বন্ধ করেননি। ক্ষুধার জ্বালায় নবীজী পেটে পাথর বেঁধে জিহাদ করেছেন, তবুও এক দিনের জন্যও অভিযান বিলম্বিত করেননি। পাহাড় সমান মিথ্যা অপবাদ চাপানো হল তার উপর, তখনও তার উদ্যাম ও উৎসাহে সামান্য পিছুটান পরিলক্ষিত হয়নি।

তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তখনও সিপাহসালারের ভূমিকায় দৃঢ়পদ ছিলেন। যখন লোকেরা তাকে ও তার গোত্রের লোকদেরকে বন্দী করে রেখেছিল, তখনও তার ইচ্ছা ও সাহসিকতায়

সামান্য ভাটার টান দেখা যায়নি। আজীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার অপশক্তির মোকাবেলায়।

বন্ধুরা আমার! নবীজীর সেই দৃঢ়তা থেকে শিক্ষা নাও। আর তার অন্তিমকালের সে সিদ্ধান্ত ও অভিযানের কথা ভুলে যেও না। তখন তিনি হযরত ইবনে যায়িদের নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে এক মুজাহিদ কাফেলা প্রেরণ করলেন। নবীজী তার উত্তরাধিকার সম্পদস্বরূপ ইল্মের পরে যা রেখে গেছেন, তাহল লৌহবর্ম, তরবারী ও বর্শা। নবীর রেখে যাওয়া এই উত্তরাধিকার সম্পদ তোমার হাত থেকে যারা ছিনিয়ে নিতে চায়, তাদের হাত ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও। বুকে ধরে এ সম্পদ তোমরা আলগে রেখো চিরকাল।

কখনও ভুলবে না, নবীজীর উত্তরাধিকার সম্পদ দুটি ঃ এক. ইলম, দুই. হাতিয়ার।

তরবারীর সাথে সখ্য

তোমাদের হাতে যতদিন ঝলমলে তরবারী থাকবে, কেউ পারবে না তোমাদের পদানত ও পরাজিত করতে। তবেই তোমরা কদম কদম এগিয়ে যাবে নেতৃত্ব ও সম্মানের শীর্ষ সোপানের দিকে। যেদিন তোমাদের হাত থেকে তরবারী খসে পড়বে, মনে করবে, সেদিন এ জাতির পতন ঘটল।

জঙ্গলের পশুও যদি নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে বসে, তবে অপর কোন হিংস্র জানোয়ার মাংস ভোজনের খাহেশ মিটাতে তার উপর আক্রমণ করে বসবেই। সাধারণ পশুও তার নিরাপত্তার প্রশ্নে আদৌ উদাসীন থাকতে পারে না। সর্বক্ষণ তাকে সতর্ক থাকতে হয়, পাছে কেউ আক্রমণ চালিয়ে তার জীবন বিপন্ন করে না তুলে। পৃথিবীর যে কোন প্রাণী আপন নিরাপত্তার বিষয়ে যখন ঔদাসিন্যের শিকার হবে, তখন আর সে শান্তি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার দাবী করতে পারে না। যে কোন সময় তার উপর প্রতিপক্ষ শক্তির আক্রমণ হতে পারে। যা বিপন্ন করে তুলবে তার ইয্যাত ও জীবনকে।

বন্ধুরা! আল্লাহর নবীর চেয়ে দ্বীনী কাজে কারও বেশী ব্যস্ততা ছিল না। এ উম্মতের জন্য তার চেয়ে অধিক দরদীও আর কেউ হবে না। সেই

দরদী নবী তার প্রিয় উম্মতের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও আত্মিক চিকিৎসায় জিহাদের পথই গ্রহণ করেছিলেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও সেই দরদী নবী মাথায় শিরস্ত্রাণ ও গায়ে বর্ম পরে তরবারী হাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রণাঙ্গনে ছুটে গিয়েছেন।

আমার প্রিয় মুসলিম ভায়েরা! মেসওয়াকের সুন্নাতের প্রতি যেমন আপনার আমার আন্তরিকতা রয়েছে, অনুরূপ তরবারীর সুন্নাতের প্রতিও আপনার আমার আমল ও গুরুত্ব থাকা একান্ত জরুরী। পাগড়ী নবীর সুন্নাত, এতে সন্দেহ নেই। অনুরূপ এ কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে, শিরস্ত্রাণ পরাও নবীরই সুন্নাত।

বিজয়ী নবীর আচরণ

আল্লাহর নবী বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, যে মক্কা থেকে এক দিন তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন, আজ তিনি বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলন্ত ঝাকরা বাবরী দুলিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। কা'বা ও মক্কাকে প্রতিমা, প্রতিমামণ্ডপ ও শিরকের মলিনতা থেকে পবিত্র করে কয়েকজন দাগী অপরাধীকে হত্যার ফরমান জারি করলেন।

বহু দিন পর নবীজী স্বাধীনচিত্তে ঘুরে ফিরে মক্কা নগরী দেখছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে সংবাদ দিল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! ইবনে খাতাল নামক যে কাফির আপনার ব্যাপারে অশালীন মন্তব্য করত, সে এখন কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। তখন প্রিয় নবী অত্যন্ত চমৎকার এক ভঙ্গিতে বিজয়ী ও একজন ফিল্ড মার্শালের মত সামান্য ঘাড় এলিয়ে এবং মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলতে খুলতে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, "যাও, ইবনে খাতালকে ওখানেই হত্যা কর।"

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের এ ঘটনাটি পড়ে আনন্দিত ও শিহরিত হয়েছি। ভক্তির আতিশয্যে তখন বলছিলাম, নবীজীর পবিত্র পদচুম্বন করে যদি নিজেকে ধন্য করে তোলার সুযোগ পেতাম!

হে আল্লাহ! আমাদের এমন পরিস্থিতি ও পটভূমি দান কর আমরাও যেন কোন অমুসলিম দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে নবীর এই সুন্নাতকে জীবন্ত করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হই।

প্রিয় বন্ধুরা!

আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল।"

আমাদের যারা এখনও এ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব পালন থেকে বিমুখ বা বিরত রয়েছেন, তারা মহাপাপ করছেন। তারা তওবা করুন। নতুবা আমাদের সকলের উপর আল্লাহর গযব আপতিত হতে পারে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! শহীদগণ জান্নাত ও মুক্তির পথ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু আমরা পেছনে পড়ে আছি। হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করে দাও।

হে আল্লাহ! তোমার মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, আমরা মুখে শুধু এ জঘন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি, অন্যায় অপরাধে সমগ্র বিশ্ব আজ ছেয়ে গেছে। আমরা সর্বক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে সেসব অন্যায় অপরাধ রুখছি না, রুখতে পারছি না। আমাদের এই অপরাধ ও অপারগতাটুকু তুমি ক্ষমা করে দাও।

আলিম সমাজের দায়িত্ব

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির একটি উপদেশ বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আয়না দেখার সময় তোমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করবে যে, তোমার চেহারা সুন্দর না কুৎসিত। যদি নিজেকে সুন্দর বলে মনে হয়, তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কর যে, এ সুন্দর চেহারাটা গুনাহ ও পাপের কালিমায় কখনও কলংকিত করব না। আর যদি দেখ তোমার আকৃতি সুন্দর নয়, তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কর যে, নিজের মধ্যে দু'টি দোষ একত্র করব না। এক হল বিশ্রী আকৃতি অপরটি হল পাপকর্ম। অর্থাৎ অসুন্দর আকৃতি এবং অসুন্দর কর্ম, এ দু'টি ত্রুটিকে নিজের জীবনে একত্রিত হতে দেব না। এ উপদেশ দ্বারা বুঝে আসে যে, সৎ ও সুন্দর কর্ম মানুষের বাহ্যিক অসুন্দর আকৃতিকে ঢেকে দেয়।

আমরা আলিম সমাজ ও দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রদের মূল্যায়ন এভাবে করে থাকি যে, সমুদ্রের মাছ, বনের পশু ও জন্তু-জানোয়ার সকলে তাদের জন্য দু'আ করে। ফেরেশতাগণ তাদের পদতলে আপন পালক ও ডানা বিছিয়ে দেন। শিলাখণ্ডের নীচে বসবাসকারী পিঁপড়েরাও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে।

তবে আজ এ বৈঠকে আমরা এ বিষয়টিকে নতুন আঙ্গিকে বিচার করব। আসুন! আমরা ভেবে দেখি, আল্লাহ তায়ালা আলিম সমাজ ও দ্বীন-শিক্ষার্থীদেরকে কি মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে এসব মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আর যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে আমাদেরকে এসব মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, তা কি আমরা যথাযথভাবে পালন করছি?

আল্লাহ আমাদের সে ইল্‌মের সম্পদ দান করেছেন, যা দ্বারা আল্লাহর পরিচয় অর্জন করা যায় এবং নবী কারীম (সাঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আমাদের সে ইল্‌মের সম্পদ দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করার পর নবী কারীম (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়।

নবী কারীম (সাঃ) এসেছিলেন গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ। তিনি পৃথিবীর বুক থেকে অনাচার, অবিচার নির্মূল করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তা।

রাসূল (সাঃ) নিজে যেসব কাজ করেছেন এবং যা আমাদেরকে করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যদি আমরা পালন করি, তবেই শিলাখণ্ডের নীচে বসবাসকারী পিঁপড়েরা, সমুদ্রের মৎস্যকুল, বনের হায়েনারা আর আকাশচারী পাখীরা আমাদের জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করবে। তখনই আমরা রাসূলের সত্যিকার অনুসারী বলে স্বীকৃত হব।

পক্ষান্তরে আমাদের দেহে প্রাণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি অসহায় মানুষ জুলুমের চাকায় নিষ্পিষ্ট হতে থাকে, হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় নিষ্পাপ শিশুরা, যদি মুসলিম মা-বোনের সতীত্ব লুণ্ঠিত হয়, জলে-স্থলে চলতে থাকে অবিচার-অনাচার, আর আমরা যদি এসব অন্যায় প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা না করি, তাহলে আমরা এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারব কি?

কুফরী চক্রের ত্রাস

বিশ্বের কুফরী চক্র উলামা ও দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে যতটুকু চিনতে পেরেছে, বাস্তবে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ততটুকু চিনতে পারিনি।

গভীর রাতে আমরা যখন বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, কাফেররা তখন তাদের গবেষণাগারে বসে আমাদের সম্পর্কে ভাবতে থাকে যে, পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্য কোন আতংক থাকলে তা হল আলিম ও দ্বীন শিক্ষার্থী ছাত্রসমাজ। আমাদের বে-দ্বীন শাসক, মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ আর বুদ্ধিজীবী নিয়ে কুফরী চক্রের কোন মাথা ব্যথাই নেই। রাজনীতির ময়দান, সামরিক ময়দান, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ময়দান-সর্বক্ষেত্রে কুফরী চক্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক আমরণ লড়াই করাকে নিজেদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তাদের দৃঢ়সংকল্প, মুসলমানদের হয় ধর্মহীন করে ছাড়ব, না হয় নিশ্চিহ্ন করে দেব পৃথিবীর বুক থেকে। এটাই এখন তাদের অন্যতম কর্মসূচী।

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

"তারা (কাফির সম্প্রদায়) সর্বদাই তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে। যদি তা তাদের শক্তিতে কুলোয়।"-(বাকারা ঃ ২১৭)।

তাই আবারও বলছি কুফরী চক্র তাদের এ লক্ষ্য ও মিশন বাস্তবায়নের পথে যাদেরকে একমাত্র প্রতিবন্ধক মনে করে, তারা হলেন আলিম সমাজ ও দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ।

রক্তমাখা ইতিহাস

ইতিহাস সাক্ষী যে, যুগে যুগে কুফরী চক্র আলিম সমাজ ও ছাত্রদের উপরই সর্বপ্রথম জুলুম-নির্যাতনের সূচনা করেছিল। আফগানিস্তানেও রুশ বাহিনী সর্বাধিক বোমা বর্ষণ করেছিল মাদ্রাসা, মসজিদ ও আলিমদের বসতবাড়ীর উপরই এবং সুবিজ্ঞ অসংখ্য আলিমকে ওরা ট্যাঙ্কের পেছনে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে শহীদ করেছে।

বোখারা, সমরকন্দ ও অপরাপর মুসলিম জনপদগুলোতে রুশ বাহিনীর হাতে সবচেয়ে বেশী যারা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তারা হলেন এই উলামা ও ছাত্ররা-ই।

উপমহাদেশে ইংরেজরা তাদের আধিপত্য বিস্তারের পর কোন জমিদার ও নবাবকে নিধন করেনি, বরং তাদেরকে তারা বড় বড় জমিদারী ও জায়গীর দিয়েছিল। ইংরেজরা কোন মিষ্টারকেও হত্যা করেনি, বরং মিস্টারদেরকে তারা মিনিষ্টারের পদে উন্নীত করেছিল।

আর যাদেরকে শূকরের চামড়ায় সেলাই করে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গাছের ডালে ডালে ফাঁসিতে ঝুলান হয়েছিল,যাদের হত্যা করে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন সেই উলামা ও দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রদেরই মহান কাফেলা।

প্রত্যয় দ্বীপ্ত কাফেলা

তবে ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী যে শ্রেণীর আলিমদের মুখোমুখি হয়েছিল, তাঁরা সত্যিকার অর্থেই ছিলেন আলিম। আমাদের মত উপাধি সর্বস্ব আলিম ছিলেন না তাঁরা। পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিরোধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মূল্যবান জীবনকে তাঁরা বিনষ্ট করেননি। তাঁরা ছিলেন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রাহঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর মত শরীয়তের কঠোর অনুসারী মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁরা ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী

(রাহঃ), মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহঃ)-এর মত রসূল (সাঃ)-এর সত্যিকার ও স্বার্থক উত্তরসূরী। তাঁরা ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রাহঃ) ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর মত হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়চেতা অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরা তাদেরকে এক পর্যায়ে এমনভাবে পরাজিত করেছিলেন যে, আজও তাঁরা সে লজ্জাকর ইতিহাস ভুলতে পারছে না এবং তাদের পরাজয়ের সে ঘা এখনও শুকায়নি।

মতানৈক্যের প্রতীক

লজ্জাকর পরাজয়ের পর ইংরেজ এবং অন্যান্য কুফরী চক্রের ষড়যন্ত্রের রূপ পাল্টে যায়। তখন তারা আলিম সমাজকে ঘায়েল করার জন্য নতুন কৌশলে কাজ শুরু করে। মহান পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া পাথেয় ছিনিয়ে নেয়া হয় আমাদের জীবন থেকে। আমরাও তাদের খপ্পরে পড়ে খুইয়ে বসি পূর্বসূরীদের উত্তরাধিকার সম্পদ। যার ফলে আমরা উন্নতির শিখর-চূড়া হতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি পতনের গভীর খাঁদে। মহান পূর্বসূরীদের এঁকে যাওয়া গৌরব ও কৃতিত্বের পথ ত্যাগ করেছি আমরা। ভুলে গিয়েছি কুরআনের সেই জিহাদী ও বিপ্লবী চেতনা, যার পরিণতিতে আজ আমরা চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতীর শিকার।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) মাল্টা কারাগার থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন ঃ উম্মতের এ পতন রোধ করতে হলে দু'টি বিষয় দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করতে হবে। প্রথমতঃ কুরআনের আদর্শ আকড়ে ধরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ পরিহার করতে হবে।

কিন্তু, অতীব দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে একজন আলিম, একজন মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র নিজের মাদ্রাসার জীবনে, মসজিদের জীবনে, সমাজ জীবনে, সবরকম দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রতিকী চিহ্ন হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। বর্তমানে তাদেরকেই সব রকম দ্বন্দ্ব-বিরোধের উৎস ও সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের হোতা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

কুফরী চক্র আলিম সমাজের উপর হরেক রকম অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম মানস থেকে আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছে। আর আমরাও কুফরী চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব খুইয়ে বসেছি। আজ আমাদের সামনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও

মিশন বলতে কিছুই নেই। আমাদেরকে আজ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও সামর্থহীন করে রাখা হয়েছে।

আলিম সমাজের দায়িত্ব

বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্ররা দাওরা হাদীস ও টাইটেল পাস করে বেরুচ্ছে। কিন্তু তাদের কারও সমানেই কোন সাবলীল চিন্তাধারা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। তাদের চিন্তা, কোথায় খাব, কোথায় গেলে বেশী অর্থ উপার্জন করা যাবে ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার হিসাব কষে দেখে যে, কোথায় গেলে সবচেয়ে বেশী অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা যাবে। বর্তমানে একজন আলিমের চিন্তা-ভাবনা তার নিজের পেট আর ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

অথচ, আল্লাহপাক আমাদেরকে ইল্‌মের সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের দায়িত্ব ছিল, সে ইলমের আলোকে বিশ্ববাসীকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এটা সত্য, এটা হক, এটা বাতিল, এটা মিথ্যা, এটা ন্যায় আর এটা অন্যায়। পৃথিবীর বুকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা আমার ও আপনারই দায়িত্ব। বিশ্বের সব প্রান্তে ইসলামকে পৌঁছিয়ে দেয়া, সে-ও আমার-আপনারই কাজ। পৃথিবীর বুকে রাসূল (সাঃ)-এর উম্মতের হিফাজত করা, তা-ও আমার-আপনারই দায়িত্ব।

আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে আলিম সমাজের সরব পদচারণা ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি একান্ত জরুরী। ইলমের মজলিসে যেমন আলিমদের থাকতে হবে, সামরিক ক্ষেত্রেও আলিমদেরকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

আলিম সমাজ ব্যতীত অন্য কেউ কুরআনের তাফসীর করলে তাতে যেমন ভুল-ভ্রান্তি হবে, সেখানে আমরা আপত্তি উত্থাপন করব এবং তাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করব, যাতে উম্মতকে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করা যায়। তেমনি আমরা এ বিষয়টি কেন ভেবে দেখছি না যে, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে সামরিক শক্তির দাপট দেখিয়ে। আর অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আজ কুক্ষিগত করে রেখেছে কুফরী শক্তি ও তাদের দোসররা। তারা এ শক্তি বলে মুসলিম উম্মাহকে প্রতিদিন শাসাচ্ছে এবং ভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি মুসলিম দেশসমূহ থেকে ইসলামী বিধি-বিধানকে রহিত করে দেয়ার আব্দার জানাচ্ছে। কোর্ট-আদালতসমূহ থেকে তাদের পরামর্শে উৎখাত করা

হয়েছে কুরআনী আইন-কানুন। আর সর্বক্ষেত্রে সুদভিত্তিক কারবার ও লেনদেন ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বিষপাম্পের মত।

আমরা আমাদের সামরিক কর্মকাণ্ড কুফরী চক্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। অথচ আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"এবং তোমরা তাদের (কুফরী চক্রের) বিরুদ্ধ (যুদ্ধের জন্য) যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর।"-(আনফাল ঃ ৬০)।

তাই বলছিলাম, কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করার অধিকার যেমন একমাত্র আলিম ব্যক্তির, তেমনি অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বও একমাত্র আলিম সমাজের হাতেই থাকতে হবে। হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করে দেখুন, রাসূলে কারীম (সাঃ) একদিকে ইল্‌মের মজলিসের মধ্যমণি ছিলেন, আবার মসজিদে নববীতে নামাযেরও ইমামতি করেছেন। অন্যদিকে বদর, ওহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে কমান্ডার-ইন-চীফের দায়িত্বও পালন করেছেন। যে ক্ষেত্রে যে কর্মকাণ্ডে আলিম সমাজের নেতৃত্ব থাকবে না, তা পরিণত হবে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির আখড়ায়। আলিম সমাজ যে ময়দানে থাকবেন না, সেখানে কোন কাজ সঠিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে না। তাই ইল্‌মের মজলিস হোক কি রাজনীতির ময়দান, দাওয়াতি কর্ম-সূচী হোক কি যুদ্ধক্ষেত্র, সর্বক্ষেত্রে আলিম সমাজের নেতৃত্ব অত্যন্ত অপরিহার্য এবং আলিম সমাজকে তাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

রুজী রোজগারের ব্যবস্থা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনের কর্মী দলকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। আমরা যদি এরূপ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করি যে, দ্বীনের জন্য কিছু করব, দ্বীনের খিদমতে শরীক হব, তাহলে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, তিনি কখনও আমাদেরকে আর্থিক সংকটে ফেলবেন না। আমাদের পূর্বসূরী উলামা ও মনীষীগণ হেরেম শরীফের মেঝেতে কপাল ঘষে ঘষে রাব্বুল আলামীনের দরবার থেকে এ ফয়সালা করিয়ে নিয়েছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী যেসব সন্তান দ্বীনের কাজে অংশ নেবে, তারা কখনও আর্থিক সংকটে পতিত হবেন না।

দেওবন্দের হযরত মিয়া ইয়াকুব সাহেব (রাহঃ)-যিনি মাজযুব প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন-এ জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতেন। একবার তিনি তিন দিন পর ঘর হতে কান্নারত অবস্থায় বের হয়ে আসলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহ পাকের নিকট থেকে নিশ্চয়তা নিচ্ছিলাম যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার সাথে (প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে) যারা সম্পর্ক রেখে দ্বীনের কাজ করবে, তাঁরা যেন আর্থিক সংকটের শিকার না হয়।

পাকিস্তানের বিখ্যাত মাদ্রাসা ইউসুফ বিন নূরী নিউ টাউনের তৎকালীন মুহতামিম মুফতী আহমাদুর রহমান (রাহঃ) বলতেন, আমরা আল্লাহ পাকের সমীপে এ দু'আ করেছি যে, আমাদের এসব দ্বীনী মাদ্রাসা-সমূহ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যেসব আলিম ইখলাসের সাথে নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের কাজ করবে, তারা কখনও যেন আর্থিক সংকটে না পড়ে।

তাই আমি হৃদয়ের গভীর হতে আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, মন থেকে খাওয়া-পরার চিন্তা দূর করে দিন। একমাত্র ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করুন। আল্লাহপাক গোটা দুনিয়াকে আমাদের সেবার জন্যই তো সৃষ্টি করেছেন। আমরা কী খাব, কী পড়ব, তা বহু পূর্বেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহপাক অত্যন্ত মর্যাদার সাথে আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। দ্বীনের জন্য যারা কাজ করবে, সাধনা করবে, ত্যাগ স্বীকার করবে, সাহায্যের জন্য কারও নিকট তাদের হাত বাড়াতে হবে না, ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর ঘটনা

মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী 'দারুল উলুম হক্কানিয়ার' চাটাইয়ে বসে ইলম অর্জন করেছিলেন। তিনি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, ইল্ম অর্জন করে ইসলামের জন্য কিছু করতে হবে। শুধু ষাটজন সাথীকে নিয়ে তিনি ময়দানে নেমে আসলেন। ইসলামের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে রুশ বাহিনীর সাথে লড়াই শুরু করলেন।

তিনি বলেন, প্রথমদিকে আমরা খাওয়ার জন্য কিছু পেতাম না। লাগাতার ছয় মাস পর্যন্ত শুধু গাছের পাতা আর ঘাস খেয়ে কাটাতে হয়েছে আমাদের। আর ঘুমাতে হয়েছে পাথরকে বালিশ বানিয়ে। সেই ছয় মাসের শেষ তিনদিন আমাদেরকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল, তা নিতান্তই মর্মান্তিক। তখন আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম, সেখানে

গাছের পাতা, এমনকি ঘাসও পর্যন্ত ছিল না। ছিল শুধু কাটাভরা লতাপাতা, যা চিবানোও সম্ভভ ছিল না। আর উপর থেকে শত্রুর বোমারু বিমান আমাদের লক্ষ্য করে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করছিল। কখনও দৌড়াতে হচ্ছিল, আর কখনও আত্মগোপন করতে হচ্ছিল। এক নাগাড়ে তিনদিন কোন কিছু না খেয়েই সাথীরা লড়াই করেছিল। অবশেষে ক্ষুধার তাড়নায় সবাই শুয়ে পড়ে। জালালুদ্দীন হক্কানী বলেন, তখন আমি তায়াম্মুম করে দু'রাকাত নামায আদায় করে দু'হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা আর কান্নাকাটি শুরু করলাম ঃ

"হে আল্লাহ! আমরা তো তোমার দ্বীনের খাতিরেই ঘর ছেড়ে বের হয়েছিলাম। আজ এ গোটা ভূখণ্ডে কুফরী শক্তি ছেয়ে গেছে। তোমার এসব দুশমনরা ভাইয়ের সাথে বোনকে বিবাহ দেয়ার মত জঘন্য কথা বলার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। হে আল্লাহ! আমরা তো তোমার দ্বীনকে বুলন্দ করার মহান লক্ষ্যেই পথে বের হয়েছিলাম। এই মুবারক রাস্তায় আমার জীবন কুরবান হয়ে গেলেও তা হবে আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমার এ সাথীরা যদি নিরাশ হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যায়, তাহলে না জানি তোমার পক্ষ হতে আযাব আর গযব নেমে আসে কিনা। তাই ওগো মাওলা! আমাদের তুমি সাহায্য কর। তোমার গায়েরী মদদ দ্বারা আমাদের জঠর ও হৃদয় তৃপ্ত কর।

তিনি বলেন, এ দু'আ করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে এক বুযুর্গের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে বললেন, 'জালালুদ্দীন! জিহাদের পথে কদম রেখেছ আর কিনা তিন দিনের ক্ষুধায় এত অস্থির হয়ে পড়ছে। মনে রেখ, এ পথে আর কোনদিন কোন প্রকার কষ্ট করতে হবে না তোমাকে।

সেই জালালুদ্দীন হক্কানীর সাথে এখন (তালেবান আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময়ে) রয়েছে এক লাখ বিশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল কাফেলা। একবার রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তিন দিন পর্যন্ত তার পেছনে ঘুরেছিল। তিনি বলছিলেন, "আমার হাতে একটুও ফুরসত নেই, জিহাদের কাজে ভীষণ ব্যস্ত আমি। তবে হ্যাঁ, ওযু করার সময়ে- ঐ সময়টুকুর মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা বলার বলতে পার।"

গৌরবের পথ একমাত্র জিহাদ

জিহাদ হল মর্যাদা, উন্নতি ও সফলতার এক সোনালী রাজপথ। জিহাদের মাধ্যমে যেমন দ্বীনের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ জিহাদ দ্বারা

দ্বীনের আনুসারীদের মার্যাদও বৃদ্ধি পায়। অথচ আজ আমরা জিহাদের আমল ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মর্যাদা ও গৌরব খুইয়ে বসেছি এবং চরম হতাশা ও হীনমন্যতায় ভুগছি।

আজ যদি একজন এসডিও অথবা কোন সাধারণ সরকারী কর্মচারী আমাদেরকে তাদের অফিসে ডেকে নিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করে, তাহলে গর্বের সাথে আমরা সে কথা সবার নিকট বলে বেড়াই যে, এসডিও সাহেবের সাথে আমি কথা বলেছি। অথচ এ সমাজে আলেম ও দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রদের কোন মর্যাদা নেই। বাজারে যাওয়ার সময় ছাত্ররা টুপি খুলে ফেলে, আর দাঁড়ি লুকানোর চেষ্টা করে, পাছে কেউ মৌলভী আর সুফী বলে সম্বোধন করে কিনা!

দ্বীন এবং দ্বীনদার ব্যক্তিগণ আজ সবখানে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত। কেন তারা লাঞ্ছিত? তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়া সম্পর্কে নবীজী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اذا تَركتم الجِهادَ فَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ

"যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহপাক তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন।" (কানযুল উম্মাল ঃ ২৮২ পৃঃ ৪র্থ খণ্ড)।

পক্ষান্তরে যেসব লোক জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছে, তারা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছে। আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে গিয়ে এক নজর তাঁদের মর্যাদার স্বরূপ দেখে আসুন। খোস্ত শহরে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে, দাঁড়িওয়ালা, টুপীওয়ালা দ্বীনদার ব্যক্তিগণই মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করছেন। আর বেদ্বীন ও দাড়িবিহীন লোকজন ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও গানবাদ্যের শব্দ হলে তা বন্ধ করতে মাওলানা হক্কানীর ছাত্ররা ক্লাশিনকভ হাতে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ গানবাদ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাওলানা ইউনুছ খালিছ, মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী, মাওলানা আরসালান খান রাহমানী, মাওলানা পীর রুহানী প্রমুখ-যারা জিহাদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন-আজ গোটা বিশ্ব তাদেরকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখছে।

নবীর ওয়ারিস

বনু কাইনুকা গোত্রের লোকেরা একজন মুসলিম রমণীর গায়ে হাত তুলেছিল। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র নবীজী (সাঃ) সাহাবীদের সশস্ত্র কাফেলা

নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সশস্ত্র সাহাবীদের দেখে ঠান্ডা মেরে গেল বনুকাইনুকা। হোদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে মাত্র একজন সাহাবী হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চৌদ্দশ' সাহাবী আমরণ লড়াই করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন।

পক্ষান্তরে আমরা নিজেদেরকে নবী করীম (সাঃ)-এর ওয়ারিস বলে দাবী করি। অথচ আজ আমাদের চোখের সামনে লাখো মুসলমানের জীবন বিপন্ন হচ্ছে, ঈমান নিয়ে পুতুল খেলা চলছে, হাজারও মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে, দেশে দেশে চলছে মুসলিম গণহত্যা, কুফরী চক্র মুসলমানদের মস্তক নিয়ে ফুটবলের মত খেলা করছে, পেয়ারা নবীর 'খতমে নবুয়াতের' আকিদা অস্বীকার করা হচ্ছে, কুরআনের পবিত্র পাতার উপর মলমূত্র ত্যাগ করছে কুফরী চক্র। এত কিছু সত্ত্বেও আমরা খানকা ও মাদ্রাসার চৌহদ্দী অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত নই। তারপরও কোন্ মুখে আমরা নিজেদেরকে ইল্মপিপাসু (তালিবে ইলম) এবং নবীর ওয়ারিস বলে দাবী করি?

কাশ্মীরের এক প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, বলুন তো, পিতার সামনে কন্যাকে উলঙ্গ করার মত লজ্জাজনক ঘটনাও কি কল্পনা করা যায়? আমার সামনে এমন লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে। হিন্দু বেনিয়ারা আমার চোখের সামনে আমার মেয়েকে উলঙ্গ করে ফেলে। সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে আমি চক্ষু বন্ধ করে ফেললাম। তারা আমার গায়ে বেয়নেটের খোঁচা দিয়ে বলল, এই তোকে এ দৃশ্য দেখতে হবে, কিন্তু আমি সে লজ্জাজনক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অচৈতন্য হয়ে মা-টিতে পড়ে যাই।

মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হতে দেখেও যদি আমাদের রক্তে আগুন না ধরে, কুরআনের পাতা পুড়ে ভস্ম করার মত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটার পরও যদি আমরা জাগ্রত না হই, তাহলে জিহাদ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলোর উপর আর কবে আমল করব? মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তরীকা ও আদর্শের উপর কবে চলব? কুরআনের মধ্যে কিতাল ও জিহাদ সম্পর্কিত যেসব আয়াত দৈনিক আমরা তিলাওয়াত করছি, সে আয়াতগুলো কোন্ সময়ের জন্য নাযিল হয়েছিল? আজকের এ দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটময় মুহূর্তেও যদি আমরা জিহাদের কাজ শুরু না করি, তাহলে আমাদের এ ইল্ম আর কাজে আসবে কবে?

বাহাদুর নবীর বীর সিপাহী

আজ কুফরী শক্তি যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। যখন ইচ্ছা আলিম সমাজকে বন্দী করছে, নৃশংসভাবে হত্যা করছে। আর নিত্যদিন আলিম সমাজ ও দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্র, ইসলামী বিদ্যাপীঠ ও মাদ্রাসাসমূহের প্রতি বিভিন্ন রকম হুমকি দিচ্ছে, কুৎসা রটাচ্ছে। আমরা তো সেই বাহাদুর নবীর ওয়ারিস, যিনি হুনাইনের রণাঙ্গনে চার হাজার তীরের মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে জিহাদী তারানা পাঠ করেছিলেন ঃ

انا النبيُ لاكذب أنا ابن عبد المطلب

"নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।"

তাহলে আমরা কেন কুফরী চক্রের হুমকিতে ভয় পাব। আজ ইহুদীরা আমাদের উপর মোড়লী করছে। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। ইহুদী গোষ্ঠী খায়বর যুদ্ধের নির্মম পরাজয়ের কথা ভুলে গিয়েছে।...... মুহাম্মদ আরাবীর(সাঃ) দূরন্ত মুজাহিদ কাফেলা আবার জিহাদের শপথ নিয়েছে, তাদের শপথ-দৃপ্ত শ্লোগানে কেঁপে কেঁপে উঠছে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও শহর-বন্দর।

خيبر خيبر يا يهود ☆ جيش محمد سوف يعود

-ওরে ইহুদী গোষ্ঠী খায়বরের নির্মম পরাজয়ের কথা আবারও মনে কর! যখন মুহাম্মদে আরাবী (সাঃ)-এর বীর মুজাহিদরা তোদের উপর হামলা করেছিল.... হ্যাঁ, অতি শিগ্‌গিরই সে মুাজহিদ কাফেলা আবার ধেয়ে আসছে।

আমরা জিহাদের পথে কোনরূপ অন্যায়-অবিচারের পক্ষপাতী নই। মানবরচিত কোন মতবাদ, মতাদর্শ আমরা মানি না। আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) নির্দেশই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয়। আমাদের জিহাদ কোন আঞ্চলিকতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়।

لاشرقيةَ ولاغربيةَ ☆ اسلاميةَ اسلاميةَ

–পূর্ব পশ্চিমের সীমানা মাড়িয়ে ইসলামকে পৌঁছে দেব আমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

والله يا رجال انا حامل بندوقية
اسلاميةَ اسلاميةَ جهادية جهادية

হে বিশ্ববাসী, শুনে রাখ! ইসলামের জন্য–জিহাদের জন্য আমরা অস্ত্র তুলেছি, গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তবে ক্ষান্ত হব আমরা।

وكتابُ اللهِ بأيدينا ☆ نَقتحمُ اليابسَ والاخضرَ

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন আমাদের হাতে রয়েছে। আমাদের জিহাদী পদচারণায় সরব হয়ে উঠবে গোটা পৃথিবী।

শানিত তরবারী হাতে নবযাত্রা

দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্র ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা এ সংকল্প গ্রহণ করুন যে, আমরা যতটুকু ইল্‌ম অর্জন করেছি এবং পরে যা করব সে ইল্‌মের উপর আমরা নিজেরা আমল করব এবং অপর মুসল-মানদের নিকটও হুবহু তা-ই পৌঁছে দেব ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী।

কেউ আমাদের উপর অপবাদ দেবে দিক, সন্ত্রাসী বলতে চায় বলুক, কেউ জিহাদকে মানবতা পরিপন্থী বলে বলুক, তাতে আমরা কর্ণপাত করব না। আমরা মানুষের নিকট হুবহু সে দ্বীন পেশ করব, যা আল্লাহপাক প্রিয় নবী (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। আমরা সে দ্বীন পেশ করব, যা কুরআনে আছে। আমরা সে দ্বীন পেশ করব, যা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন এবং নিজেও যার উপর আমল করে গেছেন।

যারা সত্যনিষ্ঠ হবে, তারা দ্বীনকে সানন্দে গ্রহণ করবে। আর যারা গোয়ার্তুমী করবে, তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবে আমাদের শানিত তরবারী।

পরিপূর্ণ দ্বীন ও জিহাদ

আমাদের শরীয়াত তথা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, এ দ্বীন সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ। কারণ, তাতে জিহাদের হুকুম বিদ্যমান। আর কোন ধর্মকেই ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না, যদি না তাতে প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"জেনে রাখা দরকার যে, সমস্ত শরীয়তের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত সেটাই যাতে জিহাদের বিধান রয়েছে।"(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ ৫৪৬ পৃঃ)।

অতএব এ পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের উপর আমরাও আমল করব এবং অন্যদের নিকটও তাই পৌঁছাব। আল্লাহপাকের কোন নির্দেশ এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন কর্ম ও আদর্শকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার অধিকার কারো নেই। নবীজী (সাঃ)-এর প্রতিটি কাজ প্রতিটি কর্ম সর্বোত্তমবৈশিষ্ট্য ও চরিত্রে সমৃদ্ধ ছিল। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নবীজী (সাঃ) তরবারী উত্তোলন করেছেন– এটা তার মহৎ চরিত্রেরই দাবী ছিল। তিনি কাফেরদের হত্যা করেছেন, তা-ও মহৎ চরিত্রেরই অংশ। তিনি কা'আব বিন আশরাফকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এ ধরনের মুনাফিক-ইহুদীকে হত্যা করা মহৎ ও উন্নত চরিত্রেরই দাবী। অত্যাচারীকে দমন করা প্রশংসিত কাজ বটে। নবীজী (সাঃ) তরবারী উত্তোলন করেছেন, এটা ইসলামেরই একটি বিধান। তিনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন এটাও ইসলামেরই হুকুম। আমরা ইসলামের এ সমস্ত সত্য ও ইনসাফপূর্ণ বিধান সবার নিকট উপস্থাপন করব এবং নিজেরাও তার উপর আমল করব।

সন্ত্রাসী কারা

আলিম সমাজ উম্মতের পথ-প্রদর্শক। এখন তারাই যদি সন্ত্রাসবাদের অপবাদ শুনে হিম্মত হারিয়ে বসেন এবং সে ভয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ পরিত্যাগ করেন, তাহলে সাধারণ উম্মতের অবস্থা কী দাঁড়াবে?

পক্ষান্তরে মুসলমানদের মাথার খুলী দিয়ে কাফের গোষ্ঠী ফুটবল খেলছে। বয়ে চলেছে মুসলমানদের রক্তের নদী। জোর গলায় শান্তি ও মানবাধিকারের দাবীদাররা সোমালিয়ায় মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছে, বসনীয় মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছে, মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য এটম, হাইড্রোজেনসহ আরও কত মারণাস্ত্র তৈরী করেছে। তাদের এসব কর্ম কি সন্ত্রাস নয়?

অপরদিকে আমার প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর আদর্শ দেখুন ঃ

তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কার মুশরিকদের মাথার ওপর দশ হাজার তরবারী উদ্ধত ছিল। মাত্র নির্দেশের অপেক্ষা। আর তখন তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ

اليوم يوم المرحمة

"আজ ক্ষমার দিন, সবাইকে ক্ষমা করা হল।"

সেই নবীকে যে সন্ত্রাসী বলবে (নাউযুবিল্লাহ), বুঝতে হবে সে একটি বদ্ধ পাগল।

সম্মানিত উলামায়ে কিরাম ও ছাত্র ভায়েরা!

আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের জন্য কিছু করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করুন অযথা মতানৈক্য পরিহার করে নিজেদের চিন্তাধারাকে উদার করতে সচেষ্ট হোন। আর কতদিন আমরা সংকীর্ণতার আবর্তে ঘুরপাক খাব!

'সন্ত্রাসী' অপবাদে শংকিত হয়ে আর লুকিয়ে থাকবেন না। অস্ত্র হাতে বুক টান করে শুরু করুন নবযাত্রা। ঝাঁপিয়ে পড়ুন রণাঙ্গনে।

এই শিক্ষাই ইসলাম আমাদেরকে দিচ্ছে, এটিই নবীজীর সত্যিকার মীরাস, এটিই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের শাশ্বত আহ্বান, গৌরব ও মর্যাদার সোনালী সোপান।

শহীদ ডঃ আদুল্লাহ আয্যাম (রাহঃ)-এর এক অমর অসীয়াতনামা

আমার হৃদয় অনুভূতি ও সমগ্র জীবন জুড়ে রয়েছে জিহাদ-পবিত্র জিহাদ

[শহীদ আবদুল্লাহ আয্যাম (রাহঃ)। বিপ্লবী অনুপ্রেরণার আধার, সফল বিপ্লবের মূর্তপ্রতীক, জিহাদী জয়বায় প্রজ্বলিত এক অগ্নিমশাল। এক অমর ইতিহাসের নাম আবদুল্লাহ আয্যাম। তাঁর জন্ম ফিলিস্তিন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের দীর্ঘ মুক্তি -সংগ্রাম, অস্বাভাবিক খোদায়ী মদদ এবং সবশেষে বিজয় অর্জন –এ শতাব্দীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এ জিহাদ ও মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বহু নওজোয়ান মর্দে মুজাহিদ। তবে আফগান জিহাদে আরব নওজোয়ানদের আত্মত্যাগ ও কুরবানী বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় ফেলে আসা সেই পেছনের ইতিহাসের কথা। আরব মুজাহিদদের এই অসামান্য কৃতীত্বের অন্যতম হকদার এই আবদুল্লাহ আয্যাম। অবশেষে আফগান জিহাদে তিনি আর কেবল আরব মুজাহিদদের নেতা রইলেন না, নিজ যোগ্যতায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন সমগ্র আফগান জিহাদের অবিসংবাদিত নেতারূপে।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা , অসাধারণ বাগ্মিতা, সৃষ্টিধর্মী লেখা তাঁকে সমাসীন করে আরও এক ধাপ উপরের আসনে। এবার তিনি পরিচিত হন আফগান জিহাদের প্রাণপুরুষ রূপে। আফগান জিহাদের উপর তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার ৪৪টি ভিডিও ক্যাসেট ও ৩শ'টি অডিও ক্যাসেট পৌঁছিয়ে দেয়া হয় আরবী ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে। তাঁর বক্তৃতা শুনে অসংখ্য নওজোয়ান ছুটে আসে আফগান জিহাদের পবিত্র রণাঙ্গনে।

তিনি তাঁর দাওয়াতী মিশন নিয়ে উল্কার মত ছুটে বেড়ান এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বহু দেশে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতে প্রমাদ গুণে। এবার তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করিয়ে দিতে তৈরী

করা হয় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি এ মহান মুজাহিদকে শহীদ করেই তবে ক্ষান্ত হয়।

শহীদ আয্যাম আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর মিশন থেমে নেই। তাঁরই প্রেরণা ও চেষ্টার ফসল হিসেবে এখন দেশে দেশে গড়ে উঠেছে জিহাদী সংগঠন। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেটগুলো বই আকারে বেরিয়েছে। এ ছাড়া তাঁর নিজ হাতে লিখিত ৭টি মূল্যবান বই মুদ্রিত হয়েছে।

এই বিশ্ববিখ্যাত মুজাহিদ নেতা ১৯৮৬ সালের ২০শে এপ্রিল সোমবার বাদ আসর খ্যাতনামা আফগান মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর বাড়ীতে বসে লিখেছিলেন তার এই অমর অসীয়তানামা। নিম্নের এই লেখা তাঁর সেই অসীয়তনামার সরল বাংলা অনুবাদ।]

আমার মন ও সমগ্র জীবন জুড়ে রয়েছে জিহাদ, জিহাদ প্রেমের আধিপত্য। এর কারণ সূরা তওবা–যা জিহাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত বিধান, যা পাঠ করে আমার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় রক্তক্ষরণ, অনুভূত হয় অশেষ বেদনা ও আফসোস। কারণ তখন আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র ব্যাপারে আমার ও উম্মাহর অমার্জনীয় উদাসীনতা।

'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা অথবা তার অকাট্য বিধানাবলী থেকে অন্যত্র দৃষ্টি সরানোর দুঃসাহস যারা প্রদর্শন করেন, তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে সূরা তাওবার 'আয়াতুস সাইফ', যে আয়াতে আল্লাহ সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ –

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও যুদ্ধ করেছে তোমাদের সাথে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (তাওবা ঃ ৩৬)।

এই সেই আয়াত, যা দ্বারা পূর্বে অবতীর্ণ জিহাদ বিষয়ক বাইশ বা ততোধিক আয়াত রহিত হয়েছে এবং রুদ্ধ হয়েছে কিতাল নিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যার সমূহ অবকাশ।

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْ م وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"অতপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (তাওবা ঃ ৫)

আল্লাহর পথে জিহাদে বের না হয়ে অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। বরং তা আল্লাহর দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করার শামিল। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে যারা লিপ্ত, তাদের থেকে দূরে থাকাই কুরআনের নির্দেশ, আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

"তাদেরকে পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।" (আন'আম ঃ ৭০)।

আমাদের মর্যাদার সুউচ্চ স্থানে আসীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। নিরেট আশা-আকাঙ্খা দ্বারা কখনও মর্যাদা অর্জিত হয়নি এবং হবেও না। মর্যাদাশীল আত্মার অধিকারী হতে হলে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে অবশ্যই।

মনে রাখা উচিত, সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল ইবাদত হচ্ছে জিহাদ। অন্য কোন ইবাদত এর সমান মর্যাদার নয়। এমনকি মসজিদুল হারাম নির্মাণ ও তথায় নিয়মিত অবস্থানেও জিহাদের সমপরিমাণ পুণ্যের আশা করা যায় না।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ "একদিন সাহাবীদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়, একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত আর মর্যাদাসম্পন্ন আমল নেই। অপরজন মসজিদুল হারাম নির্মাণকে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আমল বলে দাবী করেন। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে তৃতীয় জন বললেন, আমার দৃষ্টিতে আল্লাহর রাহে জিহাদই বড় আমল। অতঃপর সাহাবীদের এই ভিন্ন ভিন্ন মতামত অবসানের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ امَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وِرِضْوَانٍ وجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করে আল্লাহ রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বয়ং তাঁদের পরওয়ারদেগার দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি।" (তাওবা ঃ ১৯-২১)।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে জবাই করা হচ্ছে আর আমরা দূর থেকে 'লা হাওলা' এবং 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করেই আপন দায়িত্ব পালন করছি বলে আত্মতৃপ্ত হচ্ছি। জুলুম প্রতিরোধে এক পা-ও

এগুতে আমরা প্রস্তুত নই। এটা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রূপ ছাড়া আর কি। এ আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদেরকে ঈমানী দায়িত্ব পালন থেকে যুগ যুগ ধরে গাফেল করে রেখেছে।

কবির ভাষায় ঃ পাপিষ্ঠ শত্রুর কবলে মুসলিম নারীর আর্তচিৎকারে ধরণী প্রকম্পিত আর মুসলমান নিদ্রার কোলে শায়িত। এটা কি করে সম্ভব? আশ্চর্য!

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'ঈমানের পরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব দায়িত্ব হচ্ছে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিরোধ করা, যার হাতে আমাদের ইহ ও পরকালীন স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমার গ্রন্থ 'আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমীন আহাম্মু ফুরুযিল আ'য়ান'- এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে আমার অভিমত হচ্ছে ঃ

● সালাত, যাকাত ও সিয়াম পরিত্যাগকারী ও কিতাল পরিত্যাগকারীর মধ্যে পার্থক্য নেই।

● জিহাদ থেকে বিরত থাকার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য; তালিম, তারবিয়াত, দাওয়াত ও গ্রন্থ রচনাসহ কোন কাজই জিহাদের দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয় না।

● দুনিয়ার প্রায় সকল মুসলিম আজ জিহাদ পরিত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত, তারা বন্দুক বহন না করার অপরাধে অপরাধী। নিতান্ত অক্ষম লোক ছাড়া যারাই আজ বন্দুক ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্যে যাবে, তারা পাপী হিসেবেই আল্লাহর সম্মুখে নীত হবে। কারণ, এরা কিতাল করেনি। কিতাল এখন ফরজে আইন। রোগাক্রান্ত ও অক্ষম ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকল মুসলিম এ ফরজ আদায়ে বাধ্য।

● আমার বিশ্বাস, আল্লাহর কাছে জিহাদ হতে অব্যাহতি পাবে শুধু চার প্রকারের মানুষ (১) অন্ধ (২) বিকলাঙ্গ (৩) অসুস্থ এবং (৪) যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। এরা ছাড়া বাকী সকল মুসলমানকে জিহাদ ত্যাগের কারণে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। চাই এ জিহাদ আফগানিস্তানে বা ফিলিস্তিনে (বা আরাকানে) হোক অথবা পৃথিবীর যে কোন ভূমিতে হোক, যা কাফের দ্বারা অপবিত্র হচ্ছে।

● আমি মনে করি, জিহাদে যোগদান করতে আজ পিতা, স্ত্রী কিংবা কর্জদাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে কোন উস্তাদ বা নেতার

সম্মতি নেয়াও ওয়াজিব নয়। অতীত ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে উপরোক্ত বিষয়ে উলামায়ে উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। আজ যদি এ বিষয়ে কেউ ভুল বুঝানোর অপচেষ্টায় মেতে ওঠে, তবে তা হবে জুলুম এবং তা হবে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছেড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একে গুরুত্বহীন মনে করা কিংবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ এখানে নেই।

● আফগানিস্তানে নির্যাতিত প্রতিটি মুসলিমের রক্ত ও লাঞ্ছিতা নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য আমরাই দায়ী। শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের সাহায্যে অগ্রসর হইনি। আমাদের উচিৎ ছিল, তাদের জন্য অস্ত্র, অন্ন ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণ করা এবং যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করা।

দাসুকী-শরহুল কাবীরের টীকায় লিখিত হয়েছে, "যদি কারও কাছে অতিরিক্ত খাদ্য থাকে এবং কোন অভুক্ত ব্যক্তিকে দেখা সত্ত্বেও সে তাকে খেতে না দেয় এবং সে যদি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তবে ঐ ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হবে। যদি খাদ্যের মালিক এ কথা মনে করে অনাহারী ব্যক্তিকে খাদ্য না দিয়ে থাকে যে, আমি আমার এ খাদ্য না দিলে সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করবে না। অতঃপর যদি অনাহারী ব্যক্তি এ কারণেই মৃত্যুবরণ করে, তবে কি তার কোন শাস্তি হবে? এ প্রসঙ্গে আ-লিমগণ দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ (১) উক্ত ব্যক্তি তার সম্পদ হতে মৃত ব্যক্তির দিয়াত আদায়ে বাধ্য থাকবে (২) আর কারও মতে, উক্ত ব্যক্তির শাস্তি 'কিসাস'; তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে খাদ্য না দেয়ার কারণে লোকটি ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেছে। হায়, পরকালে কি পরিণাম অপেক্ষা করছে সম্পদশালী ও বিত্তবানদের জন্য– যারা নিজেদের মনোবৃত্তির জন্য অর্থের অপচয় করছে অথচ অনাহারী মুসলমানদের জন্য তারা সামান্য অনুদান দিতেও কুণ্ঠিত।

ও হে মুসলমান! তোমাদের জীবন মানেই জিহাদ, তোমাদের সম্মান মানেই জিহাদ। জিহাদের সাথেই জড়িত তোমাদের অস্তিত্ব।

হে দাওয়াত কর্মীগণ! তোমাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং কাফির, অত্যাচারী ও তাগুতের জনপদ বিরান করে দিতে হবে। নতুবা এ আকাশের ছায়ায় তোমাদের কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না।

যাদের ধারণা, কিতাল, জিহাদ ও রক্ত দেয়া ছাড়াই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত

হবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। দ্বীনের মর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তারা অবগত নন। কিতাল ব্যতীত দাওয়াত কর্মীর প্রতাপ, দাওয়াতের প্রভাব ও মুসলমানের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ শত্রুর হৃদয় হতে তোমাদের প্রভাব দূরীভূত করে দেবেন। আর তোমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ঠ করিয়ে দেবেন 'ওয়াহান'। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, 'ওয়াহান' কি? তিনি বললেন, দুনিয়া-প্রীতি ও মৃত্যু-ঘৃণা।" অন্য বর্ণনা মতে ওয়াহান মানে কিতালের প্রতি অনীহা ও ঘৃণা পোষণ করা। কুরআনের ঘোষণা ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَاتُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسى اللّٰهُ اَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَاَشَدُّ تَنْكِيْلًا

"হে রাসূল, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদের উৎসাহিত করতে থাকুন, শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরের শক্তি সামর্থ খর্ব করে দিবেন। আর আল্লাহ শক্তি সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা।" (নিসা ঃ ৮৪)।

কিতালের অনুপস্থিতিতে শিরক ও ফিতনার সয়লাব বয়ে যাবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে শিরকের বিজয় পতাকা। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (আনফাল ঃ ৩৯)।

জিহাদই পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র গ্যারান্টি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

"আল্লাহ যদি এককে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত।" (বাকারা ঃ ২৫১ আয়াতাংশ)।

জিহাদই ইবাদাতখানা ও পবিত্র স্থানসমূহের সম্মান নিশ্চিত করতে পারে এবং এর অবমাননা রোধ করতে পারে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

"আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খৃস্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। যেগুলোয় আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।" (হজ্ব ঃ ৪০)

অতএব হে মুসলিম! মসজিদসমূহের পবিত্রতা ও আপন অস্তিত্বের স্বার্থেই তোমাদের জিহাদ করতে হবে।

হে ইসলামের মহান দায়ী! মৃত্যুর আকাঙ্খী হও, পাবে তুমি অমর জীবন, আশা ও বিলাস প্রতারণার শিকার হয়ো না, আর আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানের প্রবঞ্চনা হতে বেঁচে থাক। নফল ইবাদত ও কিতাব অধ্যয়ন যেন কিতাল সম্পর্কে তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। সাবধান! বিলাসিতা যেন তোমাকে এ মহান দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ

"আর তোমরা কামনা করছিলে তা, যাতে কোন রকম কন্টক নেই।" (আনফাল ঃ ৭)।

জিহাদের ব্যাপারে কারও অন্যায়-অনুসরণ কর না। জিহাদের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিতে নেতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। নিশ্চয় জিহাদ দাওয়াতী মিশনের স্তম্ভ, তোমার ধর্মের মজবুত আশ্রয় কেন্দ্র ও তোমার শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী।

উলমায়ে ইসলামকে বলছি ঃ

আপন প্রভূর পানে ফিরে আসতে চায় এ প্রজন্ম। এদের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসুন। দুনিয়ার আসক্তি হতে নিজেকে মুক্ত রাখুন। সাবধান! তাগুত ও খোদাদ্রোহী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না। তাহলে আপনার হৃদয়ালোক ছেঁয়ে যাবে অমানিশায়, আপনার আত্মার ঘটবে অপমৃত্যু এবং জনগণ ও আপনার মাঝে সৃষ্টি হবে বিচ্ছিন্নতার বিশাল প্রাচীর।

হে মুসলমান! অলসনিদ্রায় কেটেছে তোমাদের বহু যুগ। তোমাদের জন্মভূমিতে আজ পাপিষ্ঠদের পদচারণা, তারা আবৃত্তি করছে বিজয়ের গান।

কবি কত সুন্দর উক্তি করেছেন ঃ

"গ্লানির নিদ্রা অতি দীর্ঘ হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় বাঘের হুংকার? খোদাদ্রোহী গোষ্ঠী গাইছে বিজয়ের সংগীত আর আমরা করছি দাসত্ব। হায় কবে ভাঙ্গব বন্দীশালা, কবে পাব মুক্তির রাজপথ।

আমি শুনতে পাই, মানবতার কারাগারে বন্দী নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ্ কবির সাথে সুর মিলিয়ে বলছে, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

হে মহীয়সী নারী সমাজ! আপনারা বিলাসপ্রিয় হবেন না, যা একান্ত প্রয়োজন তাই করুন। অল্পে তুষ্ট থাকুন। আপনার সন্তানকে নির্ভীক, দুর্জয়, সাহসী মুজাহিদরূপে গড়ে তুলুন। আপনার ঘর যেন হয় সিংহ-শাবকের লালনভূমি। তাকে ভীরু মুরগীর চারণক্ষেত্রে পরিণত করবেন না- যারা তাজা ও পুষ্ট হয় অন্য জীবের উদরপূর্তির জন্য। আপনার সন্তানের মাঝে সৃষ্টি করুন জিহাদপ্রেম, তারুণ্যের তেজ ও দিগ্বিজয়ের দূরন্ত নেশা। মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকুন, আপনার জীবনে সপ্তাহের একটি দিন অন্ততঃ এমনভাবে কাটান, যা মুহাজিরীন ও মুজাহিদীনের জীবনাচারের পরিচয় বহন করে। তাদের ন্যায় শুকনো রুটি ও সামান্য তরকারী আপনি আহার করুন। এভাবে ঘরে বসেও আপনি লালন করতে পারেন জিহাদী চিন্তা, বিজয়ীর চেতনা।

ওহে শিশু কিশোর দল! তোমরাই আগামী দিনের তরুণ যুবক, মিল্লাতের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক, আজ হতে সামরিক প্রশিক্ষণ নাও। রপ্ত কর যাবতীয় সমর কৌশল। ট্যাংক ও অস্ত্রই হোক তোমার খেলনা। বিলাসবহুল জীবন নয়, তোমার প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু মুক্ত বিহঙ্গের জীবন। এড়িয়ে চল ফুলশয্যা, বরণ কর কন্টকপূর্ণ গৃহাঙ্গন। সংগীতের সুরের চেয়ে তরবারীর ঝংকার হোক তোমার প্রিয় বিষয়। তবেই ছুড়তে পারবে শত্রুর প্রতি চ্যালেঞ্জ। একদিন তোমার দ্বারা সূচিত হবে মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহাসিক বিজয়।

সুপ্রিয়া! হে মোর সহধর্মিনী!

১৯৬৯ এর সে কষ্টকর সময়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আমাদের ঘরে ছিল দু'কিশোর ও এক শিশুসন্তান, কাঁচা ইটের তৈরী ছিল আমাদের আবাসঘর। ছিল না কোন আলাদা রান্নাঘর। তোমার উপরই ন্যস্ত করেছিলাম পুরো সংসার। একদিন সন্তানরা বড় হল, আমাদের

পরিচিতিও বৃদ্ধি পেল, অতিথিতে সরগরম হয়ে উঠল আমাদের ঘর। আর তুমি ছিলে তখন সন্তান-সম্ভাবা। তোমার কষ্ট ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু সবকিছুই তুমি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি, লক্ষ্য ছিল আমার সহায়তা করা। আল্লাহ্ তোমাকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। সত্যিই আল্লাহর দয়া ও তোমার ধৈর্য না হলে আমার একার পক্ষে এ বিরাট বোঝা উঠান সম্ভব ছিল না।

হে প্রিয়া আমার!

এ জীবনে তোমাকে দেখেছি দুনিয়াবিমুখ, পার্থিব বস্তুর প্রতি ছিল না তোমার কোন অনুরাগ, দরিদ্রতার প্রতি ছিল না তোমার কোন অভিযোগ। আর স্বচ্ছল সময়েও দেখিনি তোমাকে বিলাসিতায় ডুবে থাকতে। দুনিয়াকে সব সময় তুমি রেখেছিলে হাতের মুঠোয়, হৃদয়ে ছিল না দুনিয়ার কোন স্থান।

মনে রাখবে, জেহাদী জীবনই আনন্দ ও সুখের জীবন। জীবনকে বিলাসিতার গড্ডালিকা- প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ায় কোন সুখ নেই। কষ্ট ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করা মহত্ত্বের পরিচয়। তাই দুনিয়ার মোহ বর্জন কর, আল্লাহর ভালবাসা পাবে। মানুষের সম্পদ দেখে লোভ কর না, তারা তোমায় ভালবাসবে।

আল-কুরআন মানব জীবনের সেরা সাথী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। রাত্রির নামায, নফল রোযা ও গভীর রজনীর ইস্তিগফার অন্তরলোকে আনে স্বচ্ছতা, সৃষ্টি করে ইবাদাতের অনুরাগ এবং পুণ্যবানদের সৎসঙ্গ, স্বল্প সম্পদ, দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকা এবং ভনিতা থেকে বিরত থাকলে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভূত হয়।

হে প্রিয়া!

আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, জান্নাতুল ফিরদাউসে পুনঃ আমাদের মিলন হোক, যেমনিভাবে দুনিয়াতে মিলিত হয়েছিলাম আমরা দু'টি প্রাণ!

হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান-সন্তুতি!

মন ভরে কোন দিন তোমাদের সঙ্গ দিতে পারিনি। আমার শিক্ষা ও তারবিয়াত তোমাদের ভাগ্যে কমই জুটেছে। অধিকাংশ সময় আমি তোমাদের থেকে বহু দূরে থেকেছি, কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। তোমরা জান, মুসলমানদের উপর বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে আছে, যার গর্জনে দুগ্ধদানকারী মায়ের কোল থেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ভয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। উম্মতের সংকটের ব্যাপকতা চিন্তা করলে কিশোর ললাটেও ভেসে

উঠছে বার্ধক্যের বলিরেখা। মুরগীর ন্যায় তোমাদের নিয়ে আমি খাঁচায় বাস করিনি। মুসলমানদের অন্তর বেদনায় জ্বলবে আর আমি আরামে বিশ্রাম নিব, সংসারসুখ উপভোগ করব? দুর্দশায় মুসলমানদের হৃদয় বিদীর্ণ হবে, নির্যাতনে জ্ঞান বিলুপ্ত হবে আর আমি ঘরে বসে থাকব? তা আমার পছন্দ নয়। কোনদিন আমি কামনা করিনি বিলাসী জীবন, সুস্বাদু ভুনা গোস্ত এবং স্ত্রী সন্তান-সন্তুতিদের নিয়ে সংসার-সুখ উপভোগ।

তোমাদের প্রতি আমার ওসিয়াত ঃ

(ক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা আঁকড়ে থাকবে।

(খ) নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবে ও কুরআন হিফ্য করার চেষ্টা করবে।

(গ) জিহ্বার হিফাযত করবে, সংযত কথা থাকবে।

(ঘ) নিয়মিত সালাত ও সিয়াম পালনসহ সৎসঙ্গ গ্রহণ করবে।

(ঙ) জিহাদী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। মনে রাখবে, কোন নেতার অধিকার নেই তোমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার। অথবা দাওয়াত ও ইরশাদের সাথে জড়িত রেখে তোমাকে ভীরু কাপুরুষ ও জিহাদবিমুখ করার। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ব্যাপারে কারও অনুমতির অপেক্ষা করবে না। হাতে অস্ত্র তুলে নাও। ঘোড়সওয়ার হও। তবে ঘোড়সওয়ারীর চেয়ে তীরন্দাযী আমার অধিক প্রিয়।

(চ) শরীয়াতের উপকারী ইলম অর্জন করবে।

(ছ) তোমরা সদা তোমাদের বড় ভাই মুহাম্মদকে মান্য করবে, তাকে সম্মান করবে, পরস্পর পোষণ করবে গভীর প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভালবাসা।

(জ) তোমরা তোমাদের দাদা-দাদীর সাথে উত্তম আচরণ করবে, তোমাদের দু'ফুফু উম্মে ফইজ ও উম্মে মুহাম্মদকে শ্রদ্ধা করবে। আল্লাহর পরে তাদের অনুগ্রহ আমার উপর অনেক।

(ঝ) আমার রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে। আমার পরিবারের সাথে নেক আচরণ করবে এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদের হক আদায় করবে।

আবার দেখা হবে বেহেশ্তের পুষ্পকাননে।

-আব্দুল্লাহ আয্যাম

১ম খন্ড সমাপ্ত